গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ৩০ জুন - ৬ জুলাই, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণের জনবিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে

— এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি

দু'টি লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম (নালকো) এবং নেভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন (এন এল সি)'র ১০ শতাংশ শেয়ার বিলগ্নীকরণের যে নিন্দনীয় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার নিয়েছে, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী তাকে ধিক্কার জানিয়ে ২৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ''জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে এভাবে বিলগ্নীকরণের আসল উদ্দেশ্য হল, শুধুমাত্র দেশিবিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার লালসা চরিতার্থ করার জন্য কালক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির বেসরকারীকরণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া, যার পরিণামে শ্রমজীবী জনগণের জীবনে বেকারি ও নির্মম শোষণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে।''

তাই, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী ও তার সেবাদাস সরকারের এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে এগিয়ে আসার জন্য কমরেড মুখার্জী দেশবাসীকে আবেদন করেছেন। সিপিএম, সিপিআই নেতাদের প্রতিও আহ্বান জানিয়ে কমরেড মুখার্জী বলেছেন, ''হয় তাঁরা এই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করুন, না হয় ইউ পি এ মোর্চা থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের আন্দোলনে যোগ দিন।''

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ

হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে সরকার জেনেশুনে পথে বসাল

সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ে পশ্চিমবাংলার ১৪২টি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের (PTTI) মধ্যে ১২২টিই বেআইনি বলে ঘোষিত হয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা, তেমনি রয়েছে খোদ রাজ্য সরকারের দ্বারা পরিচালিত সংস্থাও। কেন্দ্রীয় সংস্থা এন সি টি ই-র (National Council of Teachers' Education) অনুমোদন না নেওয়ায় এই সংস্থাগুলি বেআইনি বলে ঘোষিত হয়েছে। এ ছাড়া ন্যূনতম শর্তগুলিও পূরণ না করে ঐসব সংস্থা চলছে বলে এগুলি আইনসম্মত নয় বলে বলা হয়েছে। এই রায়ের ফলে হাজার হাজার শিক্ষার্থী — যাঁরা এই সমস্ত শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন তাঁদের সার্টিফিকেটগুলিও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং যাঁরা ইতিমধ্যে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের চাকরির উপরেও নেমে আসবে বিপদের খাঁড়া। এই সঙ্গে অতি সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদ এক সার্কুলারে গত ১২ জুন ঘোষণা করেছে, এই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের ফাইনাল পরীক্ষা এখন হবে না, অনির্দিষ্টকালের জন্য তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৬ জুন থেকে এই পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। শেষমুহূর্তে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদের এই ঘোষণায় প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী যাঁরা সারা বছর পড়াশুনা করে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিলেন — তাঁদের মাথায় নেমে এল বজ্রাঘাত। অথচ পরীক্ষা বন্ধ করার ক্ষেত্রে যদি হাইকোর্টের আদেশ হয়ে থাকে তবে তা হয়েছিল অনেক আগেই, কিন্তু সরকার তা রদ করার জন্য এতদিন কোন প্রচেষ্টা নেয়নি কেন, বা তারা বিষয়টা শিক্ষার্থীদের আগে জানায়নি কেন। এতো জেনেশুনে শিক্ষার্থীদের বিপাকে ফেলার ঘৃণ্য কৌশল!

এরকম অবস্থা হল কেন? বিষয়টা কি এমন যে রাজ্য সরকার কিছুই জানত না, তাই এমন ঘটল? অর্থাৎ তাদের অজ্ঞতার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, একথা কি কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য? কোন্ আইনের বলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালালে তা বৈধ হয় — তা কি সরকারের অজানা? তাহলে বাকি ২০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কিভাবে বৈধ রইল? তাহলে রাজ্য সরকার জানত — কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ করে কীভাবে পরিচালনা করলে তা বৈধ হয়, কোন্গুলি পূরণ না করলে অবৈধ হয়। সরকার জেনেশুনে এরকম বিপজ্জনক খেলা খেলল কেন?

আগে নিয়ম ছিল, প্রাথমিক শিক্ষকপদে চাকরি পেতে হলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরাও যেমন সুযোগ পেতেন, তেমনি বিনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্যও এই সুযোগ ছিল। ফলে প্রশিক্ষণ নিতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা আগে ছিল না। এছাড়া ছিল সংগঠক স্কুল পরিচালনা করে সরকারি অনুমোদন লাভের ব্যবস্থা। যাঁরা এই স্কুলগুলির সংগঠক ছিলেন তাঁরাও স্কুল অনুমোদনের সঙ্গে চাকরি পেতেন — এঁরা প্রায় কেউই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। এছাড়া চাকরিতে যোগদানের পর স্কুল থেকে ডেপুটেশনে ট্রেনিং নিতে যাওয়ার সুযোগও আগে ছিল। মূলত এই ব্যবস্থাটিই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল। বেশিরভাগই চাকরি

সাতের পাতায় দেখুন

৭ কেন, ১৭ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেই বা ক্ষতি কী ছিল

'ঘাটতি শূন্য বাজেট', 'বিকল্প বাজেটে'র পর রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তর নয়া শ্লোগান হল 'উন্নয়নমুখী বাজেট'। কীসের উন্নয়ন ? শ্রমিকদের প্রাপ্য আত্মসাতের চ্যাম্পিয়ান রাজ্যের চা-বাগান মালিক আর চটকল মালিকদের জন্য বাজেটে ঢালাও সুযোগসুবিধা দেওয়া কার উন্নয়নের জন্য ? সঙ্গে অবশ্য অসীম দাশগুপ্ত জনগণের সামনে সাত লাখ কর্মসংস্থানের লোভের টোপ ঝুলিয়ে মালিকদরদী বাজেটকে জনদরদী সাজাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু হলদিয়া পেট্রোকেমে 'এক লাখ চাকরি', 'রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়া'র পর রাজ্যের বেকার সংখ্যা সত্তর লাখ ছুঁয়েছে। কাজেই সাত লাখের চাকরির নতুন টোপ হল জোচ্চোরের বাড়ি ফলার, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

'ঘাটতি শূন্য বাজেটের ধোঁকা ধরা পড়ার পর অসীমবাবু এবার 'উন্নয়নমুখী' বাজেটে ঘাটতি দেখিয়েছেন মাত্র ছ'কোটি টাকা। অসীমবাবু অর্থনীতিবিদ বটে, তবে ন্যায়শাস্ত্রেরও পণ্ডিত নিশ্চয়। কারণ ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন — 'হয়কে নয় করার নাম ন্যায়শাস্ত্র'। বাজেটে অসীমবাবু তাই করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রস্তাবিত রাজকোষ ঘাটতি হচ্ছে ১০,৫৭২ কোটি টাকা। গত বছর তিনি দেখিয়েছিলেন, বাজেটে (প্রস্তাবিত) রাজকোষ ঘাটতি হবে ১০,২৫০ কোটি টাকা, বছর শেষে তিনি বলেছেন (সংশোধিত হিসাবে), রাজকোষ ঘাটতি হয়েছে ১১,৮৭৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১,৬২৫ কোটি টাকা ঘাটতি বেড়েছে। প্রকৃত হিসাবে, যা দেওয়া হবে ২০০৭ সালে, কত বাড়বে কে জানে। কাজেই ১০,৫৭২ কোটি টাকার বর্তমান ঘাটতি কোথায় দাঁড়াবে তা অসীমবাবুই বলতে পারবেন।

অসীমবাবু বর্তমান বাজেটে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থাৎ ৬ বছরে মাত্র ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধিতে বেঁধে রাখতে সফল হয়েছেন। সাবাস, বামপন্থী অর্থসাশ্রয় পদ্ধতি ! পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের প্রায় সবটাই হল বেতন খাতে ব্যয়। এই ব্যয় ৬ বছরে ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধির সীমায় বাঁধার অর্থ হল, নতুন নিয়োগ বন্ধ রাখা এবং পুরনো কর্মীদের ওয়েজ ফ্রিজ করা। কারণ ৬ বছরে টাকার মূল্য যে হারে কমেছে তাতে ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধির অর্থ বেতন প্রায় ১৯৯৯ সালেই

সাতের পাতায় দেখুন

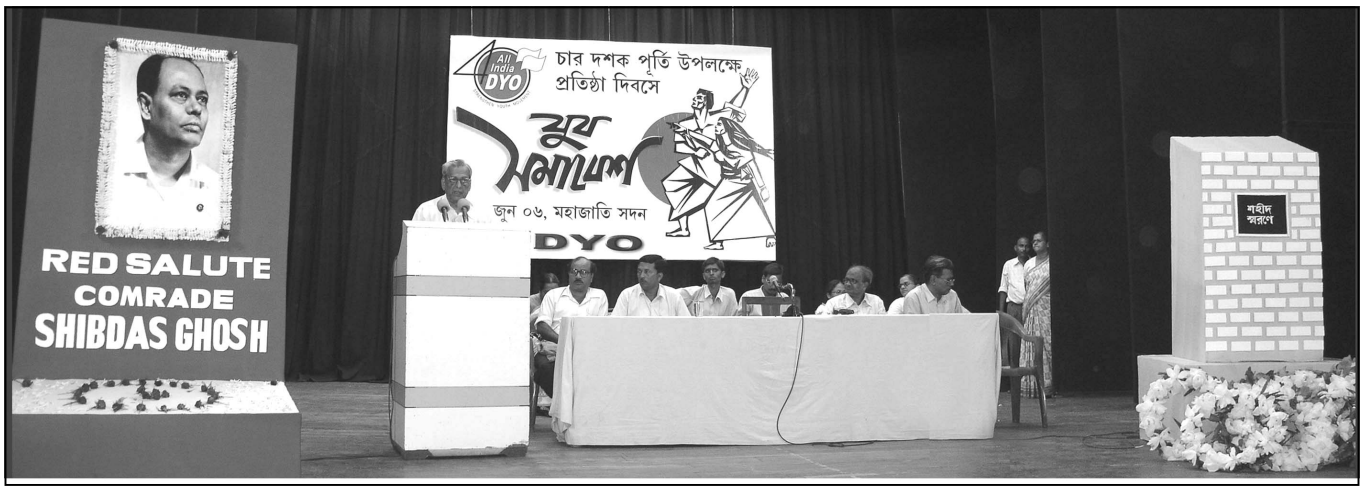

২৬ জুন সারা ভারত ডি ওয়াই ও'র ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহাজাতি সদনে বিশাল যুবসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী। (বিস্তারিত সংবাদ আগামী সংখ্যায়)

মুর্শিদাবাদ

জনজীবনের বিভিন্ন দাবিতে গণঅবস্থান

বর্ষার শুরুতেই ভাঙনের করাল থাবা, বন্যার ভ্রুকুটি, পানীয় জলে আর্সেনিকের বিষ। রাজ্যজুড়ে শিল্পায়নের বিজ্ঞাপন চলছে, কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলা তথা জেলা সদর বহরমপুরে কোন শিল্প নেই। জেলা সদর হাসপাতাল ও নিউ জেনারেল হাসপাতালে পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স নেই, বিনা চিকিৎসায় রোগী মরছে। ভর্তির সময়ে স্কুলগুলি ছাত্র-অভিভাবকদের কাছ থেকে ব্যাপক ফি আদায় করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পেট্রল-ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের ওপর নানা কর চাপাচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধি করছে; তার সাথে কংগ্রেস পরিচালিত বহরমপুর পৌরসভা উন্নয়নের প্রচারের আড়ালে সীমাহীন মিউটেশন ফি, ট্রেড ট্যাক্স, অন্যান্য বর্ধিত পৌরকর আদায় করছে। বহরমপুর শহর সহ সমগ্র থানার অসংখ্য গরিব মানুষের রেশনকার্ড নেই, বিপিএল তালিকায় নাম নেই। বহরমপুর শহরের বেশ কিছু হোটেলের অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের শিকার হচ্ছে ছাত্রযুবকরা। রাজ্য সরকারের মদতে অলিতে গলিতে মদের দোকান আর অনলাইন লটারির ফাঁদে চলছে সর্বস্বান্ত মানুষের আত্মহত্যা। আর নিঃস্ব পরিবারের হাহাকার। জনজীবনের এইসব জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার পদক্ষেপ হিসাবে ১৫ জুন বহরমপুর প্রশাসনিক ভবনের সামনে এস ইউ সি আই বহরমপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে গণঅবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। এই অবস্থানে দলের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কুনাল বিশ্বাস সহ অন্যান্যেরা বক্তব্য রাখেন। অবস্থানের শেষে বহরমপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অপূর্ব ব্যানার্জী দাবিগুলি নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন।

উত্তর ২৪ পরগণা

করমুক্ত ডিজেলের দাবিতে চাষীদের বিক্ষোভ

২১জুন, জেলার প্রায় সর্বত্রই চাষীরা বিক্ষোভ দেখায়। বাগদা, বনগাঁ, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, হাবড়া, অশোকনগর, আমডাঙা প্রভৃতি ব্লকে সংগঠিত ভাবে বিক্ষোভ জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। চাষীদের কাছে এই বিক্ষোভ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছিল সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটি। বিক্ষোভকারী কৃষক ও মজুরদের দাবি ছিল, (১) কৃষককে একরে ৩০০ লিটার করমুক্ত ডিজেল দিতে হবে ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে, (২) বিদ্যুতের বিশেষত কৃষি বিদ্যুতের মাশুল কমাতে হবে এবং (৩) মজুরদের ১০০ দিনের কাজ দেবার কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইনকে কার্যকর করতে হবে।

চাষীদের বক্তব্য, ডিজেলই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সেচব্যবস্থার মেরুদণ্ড। অথচ প্রতিবছর ৫/৬ বার করে ডিজেলের দাম বাড়ছে। এই দামবৃদ্ধির বোঝা কৃষকদের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। কারণ ফসলের দাম বাড়ছে না, খরচ বাড়ছে। সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের বক্তব্য, ডিজেলের দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল ডিজেলের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাপানো কর। প্রতি লিটার ডিজেলে চাপানো করই হল প্রায় ১৬ টাকা, যা প্রত্যাহার করে নিলে চাষীরা প্রতি লিটার ২০ টাকা দরে ডিজেল পেতে পারে। অতএব, কৃষিপ্রধান দেশের কৃষককে এই করমুক্ত দরেই ডিজেল সরবরাহ করতে হবে। তা না হলে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮ লক্ষ চাষী সেচের অভাবে চাষ বন্ধ করতে বাধ্য হবে। করমুক্ত ডিজেলের দাবিতে আন্দোলনকে আরও দুর্বারও ব্যাপক করে গড়ে তোলার আহ্বান জানায় এ আই কে কে এম এস।

বিক্ষোভ হরিণঘাটাতেও

২১ জুন, সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে হরিণঘাটা বিডিও অফিসে চাষীরা বিক্ষোভ দেখায়। তাদের বক্তব্য, সেচের জন্য কৃষককে একরে ৩০০ লিটার করমুক্ত ডিজেল দিতে হবে এবং ডিজেলের উপর থেকে সমস্ত রকম কর ও শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে।

এই বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস সহ স্থানীয় সংগঠকরা।

হাওড়া

জলসরবরাহ ও নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে বালী পৌরসভায় ডেপুটেশন

বালী পুরসভায় প্রায় দুই লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। প্রখর গ্রীষ্মে ভীষণ জলসঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। প্রয়োজনীয় পরিমাণে জল সরবরাহ তো দূরের কথা ন্যূনতম পানীয় জলও বালী পুরসভা সরবরাহ করতে ব্যর্থ। অন্যান্য পরিষেবা তো অনেক দূরের কথা। পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ, জলনিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি পাঁচ দফা দাবিতে বিগত পনের দিন যাবৎ এস ইউ সি আই দলের বালী এবং বেলুড় অঞ্চলের কর্মীরা স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালান। বিভিন্ন এলাকায় সিপিএম কর্মীরা স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু আশার কথা, জনসাধারণ বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে স্বাক্ষর দেন। ২৩ জুন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অলোক ঘোষের নেতৃত্বে চারজন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল পাঁচ সহস্রাধিক স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র পুরসভার চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেন। পুরসভার পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং দু'জন কমিশনার। প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের সম্পূর্ণ পরিকাঠামো যে পুরসভার নেই তা তাঁরা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, ২০০৭-এর ডিসেম্বরের আগে সমগ্র পুরসভা এলাকার জল সরবরাহ সম্ভব নয়। প্রতিনিধিদের বলিষ্ঠ যুক্তির চাপে আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের কথা দিতে পুরপ্রধান বাধ্য হন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবিপূরণ না হলে অদূর ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন বলে প্রতিনিধিদল জানিয়ে আসেন। দাবিগুলির সমর্থনে দুই শতাধিক মানুষের এক মিছিল বেলুড় বাজার থেকে বালী পুরসভায় যায়।

কমরেড বীণাপাণি দাশগুপ্ত লাল সেলাম

দলের প্রবীণ সদস্যা, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দমদম শাখার প্রাক্তন সভানেত্রী কমরেড বীণাপাণি দাশগুপ্ত দীর্ঘ রোগভোগের পর ৮৩ বছর বয়সে গত ১৮ জুন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন দমদম-কেষ্টপুর অঞ্চলে সকলের মাতৃস্থানীয়া মাসিমা।

কমরেড বীণাপাণি দাশগুপ্ত ছিলেন দল অন্তপ্রাণ। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় প্রবল শারীরিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাঁর পার্টির মাসিক চাঁদা, মহিলা সংগঠনের চাঁদা কমরেড অতসী মুখার্জীর হাতে তুলে দিয়ে যেতে তিনি বিস্মৃত হননি। মৃত্যুর আগের দিন তাঁকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়।

তাঁর দাদা ছিলেন পরাধীন ভারতে বিপ্লববাদী দলের সাথে যুক্ত। এছাড়া সেই কৈশোরেই মাস্টারদা সূর্য সেন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের গোপন আশ্রয়ে খাওয়ানো ও অন্যান্য সাহায্য করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী জীবনের ভাবধারা তাঁর মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রথমে তাঁর বড় মেয়ে এবং পরে অন্য ছেলেমেয়েরা যখন এস ইউ সি আই-এর সংস্পর্শে আসেন তখন এই দলের নেতাদের তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পান। এঁদের মধ্যেই তিনি পরাধীন ভারতের বিপ্লবীদের দেখতে পান, তাঁদের সাথে মিল খুঁজে পান। ধীরে ধীরে তিনি দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। ছেলেমেয়েদের দলের কাজে উৎসাহ দিতে থাকেন। পরবর্তীকালে ছেলেমেয়েরা দলের কাজে অবহেলা করলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন, দুঃখ পেতেন। দলের সব ছেলেমেয়েদেরই তিনি সন্তানের মত ভালবাসতেন। পারিবারিক বিষয়েও দলের নেতাদেরই তিনি অভিভাবক মনে করতেন। স্কুল-কলেজের ডিগ্রি তাঁর ছিল না, কিন্তু দলের বাংলা পত্রপত্রিকা মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। আমাদের দেশে অনেকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ গ্রহণ করলেও ব্যক্তিজীবনে ধর্মীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন না। মাসিমা, বেশি বয়সে দলের সংস্পর্শে আসার পরেও বিস্ময়করভাবে ধর্মীয় সংস্কারের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি হৃদরোগ সহ নানা ব্যাধিতে ভুগছিলেন। কানেও শুনতে পেতেন না। তা সত্ত্বেও যতদিন পেরেছেন দলের প্রতিটি মিটিং-মিছিলে গিয়েছেন। যখন চলৎশক্তিরহিত হয়ে পড়েছেন, তখনও কষ্ট করে দলের বুকস্টলে গিয়ে বসতেন। বলতেন, 'আমার কমরেডদের সাথে থাকতেই ভাল লাগে'। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কুলতলিতে সিপিএম-এর যে সন্ত্রাস চলছে — আমাদের নেতা-কর্মীরা খুন হচ্ছেন, গ্রেপ্তার হচ্ছেন, গ্রামছাড়া হচ্ছেন — মাসিমা গভীর উদ্বেগে সবসময় অন্য কমরেডদের কাছ থেকে তাঁদের সংবাদ নিতেন। ঐতিহাসিক ভাষাশিক্ষা আন্দোলনে দমদম এলাকায় যখন দলের কর্মীরা সিপিএম আশ্রিত গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন তিনি ঐ বৃদ্ধ বয়সেও ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্মীদের রক্ষা করতে গুণ্ডাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন।

সামাজিক স্বার্থে মেডিক্যাল শিক্ষার সাহায্যকল্পে তিনি মৃত্যুর পর তাঁর দেহদান করার জন্য 'গণদর্পণ' সংস্থার কাছে অঙ্গীকার করেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর মরদেহ ঐ সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড সাধনা চৌধুরী ও অন্যান্য কমরেডগণ তাঁর মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

কমরেড বীণাপাণি দাশগুপ্ত লাল সেলাম।

সকল ছাত্রের ভর্তির দাবিতে উপাচার্যের কাছে ডি এস ও'র ডেপুটেশন

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর কলেজে স্নাতকস্তরে ভর্তির সমস্যা এ বছরেও ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। এবারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় ২১ হাজার ছাত্রছাত্রী বেশি পাশ করলেও কলেজের আসনসংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়েনি। তার সাথে চলছে ভর্তির সময় প্রচুর ফি ও ডোনেশন নেওয়া। ফলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দের কলেজে পছন্দমত বিষয়ে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। পাশ করা সকল ছাত্রের ভর্তির দাবিতে এবং উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ নতুন কলেজ খুলে ভর্তি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে ও এই ব্যাপক পরিমাণ ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গত ১৫ জুন এ আই ডি এস ও'র কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়া প্রদক্ষিণ করে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে একটি বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও'র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজিত পাত্র। এরপর ছাত্রছাত্রীরা ডেপুটেশন দিতে যায় এবং সেখানে বিক্ষোভ সভায় এ আই ডি এস ও'র কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড অঞ্জনাভ চক্রবর্তী এই ব্যাপক ভর্তি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের দাবিতে আরও তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

বীরভূম

ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে ডি এস ও'র জয়

মুরারই এ কে ইনস্টিটিউশন স্কুল কর্তৃপক্ষ একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ডোনেশন সহ ৩৫০ টাকা ফি আদায়ের পরিকল্পনা করে। এর বিরুদ্ধে ডি এস ও'র উদ্যোগে গড়ে ওঠে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। গত ২২ মে ঐ কমিটির নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বয়কট করে এবং তাদের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দেয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের আবেদনে কর্ণপাত না করায় পরের দিন ছাত্রছাত্রীদের বিশাল মিছিল মুরারই শহর পরিক্রমা করে এবং বিডিওকে ডেপুটেশন দেয়। বিডিও'র নির্দেশে স্কুল কর্তৃপক্ষ ১০০ টাকা ফি কমানোর কথা ঘোষণা করেও গ্রীষ্মাবকাশের পর পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। এমতাবস্থায় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এবং ডি এস ও'র ডাকে ১৩ জুন ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ শুধু দ্বাদশ শ্রেণীতেই নয়, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্যও ৩৫০ টাকার পরিবর্তে ১৯০ টাকা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

নর্মদা বাঁধ

উচ্ছেদ হওয়া সকলকে সর্বাগ্রে যথার্থ পুনর্বাসন দিতে হবে

গুজরাটে নর্মদা নদীর উপর নির্মিত সর্দার সরোবর বাঁধের উচ্চতাবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের অন্যান্য দাবির মধ্যে অন্যতম একটি দাবি হচ্ছে, বাঁধের কারণে জমিহারা উদ্বাস্তুদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ সরকারকে দিতে হবে। এই দাবির সমর্থনে চলচ্চিত্র শিল্পী আমির খানের বিবৃতি এবং এর প্রতিক্রিয়ায় গুজরাটে আমির খান অভিনীত সিনেমা বয়কট, আবার পরে বয়কট প্রত্যাহার — পর পর ঘটে যাওয়া এ ধরনের ঘটনা বাঁধ দেওয়ার যৌক্তিকতা এবং বাস্তুহারাদের প্রকৃত ক্ষতিপূরণের প্রশ্নকে আবার সামনে এনেছে। এদেশে কৃষিক্ষেত্রে ক্রমাগত পুঁজি বিনিয়োগ এবং সীমিত অর্থে আধুনিকীকরণের ফলে আধুনিক অতি উৎপাদনশীল বীজের ব্যবহার এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেচের জন্য জলের প্রয়োজন বাড়ছে। তার সঙ্গে শিল্পের এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও জলের প্রয়োজন বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে এইভাবে জলের প্রয়োজন যেমন যেমন বেড়েছে, তেমন তেমনভাবেই অগ্রসর রাজ্যগুলির মধ্যে নদীর জলের ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ বেড়েছে। উৎসমুখ থেকে বেরিয়ে নদী যে সমস্ত রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে ওপরের দিকে অর্থাৎ উজানের রাজ্য বেশি জল তুলে নিচ্ছে বা বাঁধ দিয়ে জল আটকে দিচ্ছে, আর নীচের দিকে, অর্থাৎ ভাটির রাজ্য তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে উজানি রাজ্য এজন্য খরা-বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও খরা-বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা রাখছে না।

পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ নদীভাঙনকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠছে যে — বৃহৎ বাঁধ দিয়ে নদী বাঁধার চেষ্টা করা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কিনা। তাছাড়া এই বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বহু মানুষের বাস্তুহারা হওয়া এবং পুনর্বাসনের প্রশ্ন।

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপট ও পশ্চিমবঙ্গের ভাঙন সমস্যা দু'য়ের পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়টি বিচার করা দরকার

গুজরাট রাজ্যের সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ এবং উত্তরের কিছু এলাকা খরাপ্রবণ। অনেক এলাকায় কেবল সেচের নয়, পানীয় জলেরও অভাব আছে। এহেন অবস্থায় জনমতের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার নর্মদা উপত্যকা প্রকল্প হাতে নেয় এবং নর্মদা ও তার উপনদীগুলির উপর ৩০০টি ছোট, ১৩৫টি মাঝারি, ৩০টি বড় ও ২টি দৈত্যাকার বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়। ওই দু'টি দৈত্যাকার বাঁধের একটি হচ্ছে সর্দার সরোবর এবং অন্যটি হচ্ছে নর্মদা সরোবর। এর মধ্যে একমাত্র সর্দার সরোবর বাঁধটিই গুজরাটে, বাকি সবই মধ্যপ্রদেশে।

নর্মদা উপত্যকা প্রকল্প হাতে নেওয়ার সময়েই এস ইউ সি আই জমিচ্যুত সকল উদ্বাস্তুর প্রকৃত পুনর্বাসন দাবি করেছিল। প্রকৃত পুনর্বাসন বলতে আমরা শুধু থোক কিছু ক্ষতিপূরণ বা যেমন তেমন একটুকরো জমি দেওয়াই নয়, জমিচ্যুত গোটা পরিবার ও তাদের উত্তরসূরিদের পূর্ণ অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দাবি করেছি। আমরা একথাও বলেছিলাম, মানুষের জীবন সম্পর্কিত ও পরিবেশগত সমস্ত প্রশ্ন বিবেচনা করেই জমিচ্যুত পরিবারগুলির সুষ্ঠু পুনর্বাসনের শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। সাথে সাথে কচ্ছ এবং সৌরাষ্ট্রের যে সমস্ত এলাকা খরাপ্রবণ সেই সমস্ত এলাকার খরাজনিত তীব্র সমস্যাগুলির আশু সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের দল সুনির্দিষ্ট বিকল্প প্রস্তাবও রেখেছিল। ১৯৮৫ সালে গুজরাটে খরাপীড়িত এলাকাগুলিতে রিলিফের কাজ করতে করতেই আমাদের দলের উদ্যোগে "দুষ্কল প্রতিরোধ সমিতি" (খরা প্রতিরোধ কমিটি) গড়ে ওঠে এবং কমিটির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে বলা হয় — সর্দার সরোবর বাঁধ কার্যকর হতে যেহেতু প্রায় ২০ বছর সময় লাগবে, তাই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে সুরাটের কাছে দহেজ থেকে ভাবনগরের কাছে ঘোঘা পর্যন্ত ক্যাম্বে উপসাগর থেকে মাটির ওপরে অথবা নীচে পাইপ লাইন বসিয়ে সৌরাষ্ট্রে নর্মদার জল সরবরাহ করা হোক। বহু বিশিষ্ট নাগরিক এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে তৈরি আমাদের এই প্রস্তাব সর্বস্তরের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছিল এবং প্রয়াত উমাশঙ্কর যোশী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ খোলাচিঠি দিয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই দাবি জানিয়েছিলেন। আমাদের প্রস্তাবকে রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে রূপায়ণযোগ্য বলে স্বীকারও করে নিয়েছিল, অথচ বাস্তবে তা রূপায়ণের কোন চেষ্টাই করেনি। কংগ্রেস পরিচালিত তৎকালীন গুজরাট সরকার ভোটের দিকে তাকিয়ে সর্দার সরোবর প্রকল্পকে গুজরাটের প্রাণভোমরা প্রতিপন্ন করে প্রচার তুঙ্গে তুলে জনসাধারণকে তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। বস্তুত এই প্রকল্পের কোন সীমাবদ্ধতার কথা কেউ তুললেই তাকে গুজরাটের স্বার্থবিরোধী বলে চিহ্নিত করে নিষ্ঠুর দমননীতি চালাতেও কংগ্রেস কসুর করেনি। অন্যদিকে যদিও অন্যান্য আরও কিছু সংগঠন এবং মেধা পাটকারের নেতৃত্বে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ন্যায্য দাবি তুলেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে বিশেষত নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন দাবিটি এমন ঢংয়ে তুলছিল যা বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাকেই উড়িয়ে দিচ্ছিল। ফলে গুজরাটে তারা বাঁধবিরোধী বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। প্রতিবাদী এইসব গোষ্ঠীগুলির উপর সরকার ও প্রশাসনের নির্যাতন ও দমনপীড়নের বিরুদ্ধে আমরা সর্বদা সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছি, কিন্তু কোন সময়ই আমরা বাঁধবিরোধী অবস্থান নিইনি। আমরা সর্বদাই বলেছি — জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক দল ও জনসাধারণের মতামত নিয়ে একটি সর্বসম্মত বাস্তব পরিকল্পনা নিতে হবে, রাজ্যের জলসমস্যা দূর করার লক্ষ্যে দৃঢ় রাজনৈতিক সঙ্কল্প নিয়ে রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হবে।

কর্তৃপক্ষের দাবি

বাঁধ নির্মাণের জন্য গঠিত নর্মদা উপত্যকা প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ বলেছিল, প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গুজরাটের সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছ সহ রাজস্থানের খরাপীড়িত এলাকায় সেচের জল সরবরাহ করা। পরবর্তীকালে পানীয় জল সরবরাহ করাকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কর্তৃপক্ষ বলেছিল, বাঁধ চালু হলে ৭৫০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ক্যানেল দিয়ে গুজরাটে ১৭.৯২ লক্ষ হেক্টর এবং রাজস্থানে ৭৩ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের জল পৌঁছবে, ১৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এবং গুজরাটের ভারুচ শহর সহ ২১০টি গ্রামকে বন্যা থেকে বাঁচানো যাবে। ১৩৫টি শহর ও ৮২৫২টি গ্রামের মানুষ বাঁধের কল্যাণে পানীয় জল পাবে।

সে সময়ে বাঁধ কর্তৃপক্ষ ঘুণাক্ষরেও যে কথা বলেনি, তা হল — বাঁধের জলাধারের তলায় চলে যাবে জনবসতি সহ ১৪,০০০ হেক্টর বনভূমি এবং ১১,৩১৮ হেক্টর কৃষিজমি। ৩৫৫টি গ্রাম ডুবে যাবে এবং গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের ১০ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হবে, যাদের পুনর্বাসন একটা বিরাট প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেবে।

মূল বাঁধের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। '৯৪ সালে সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের হলে কাজ আটকে যায়। ১৯৯৯ সালে সুপ্রিম- কোর্ট সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং পরিবেশ রক্ষার শর্ত মেনে কাজ শুরু করার অনুমতি দেয়। সুপ্রিমকোর্ট বাঁধের উচ্চতা ৯০ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১৩৬ মিটার করার অনুমতি দেয় এবং বাঁধের কাজ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা একই সাথে করতে বলে।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

প্রস্তাবিত ৪৫৮ কিমি মূল ক্যানেলের মধ্যে ৩৫৬ কিমি ক্যানেল এবং ৮৬,০০০ কিমি শাখা ক্যানেলের মধ্যে ১১,৫০০ কিমি ক্যানেল কাটা হয়েছে। কিন্তু উত্তর গুজরাট, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছের খরা সমস্যার বিন্দুমাত্র সুরাহা হয়নি। নর্মদা, ভারুচ, ভদোদরা, গান্ধীনগর, খেড়া এবং পঞ্চমহল সংলগ্ন বাঁধ এলাকার কাজ প্রায় আধাআধি সম্পন্ন হয়েছে। সরকার বলছে, ৫০০০০ চেক ড্যাম (পরিপূরক ছোট বাঁধ) তৈরি হয়েছে। কিন্তু সকলেই জানেন, এর বেশিরভাগই হয়েছে কাগজে, যে ক'টি সত্যিই তৈরি হয়েছে সেগুলি শুকনো খটখটে। অন্যান্য রাজ্য মিলিয়ে ৭২টি বাঁধেরও একই হাল। ৩১টি বাঁধই শুকনো। এমন শম্বুক গতিতে কাজ চললে কতদিনে ৮২৫২টি গ্রাম ও ১৩৫টি শহরে পানীয় জল যাবে এবং ১৭.৯২ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের জল পাবে তা কেউ জানে না।

বস্তুত সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও উত্তর গুজরাটে পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব। বিজেপি পরিচালিত নরেন্দ্র মোদি সরকার এই সমস্যার কোন সুরাহা তো করছেই না, বরং মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো পঞ্চায়েত এবং আঞ্চলিক প্রশাসনের মাধ্যমে জলের জন্য বড় রকম কর চাপানোর চেষ্টা করছে। জল নেই, তবু জলকর বাড়াচ্ছে পাঁচ-দশ গুণ। ধর্মীয় উৎসব বা ওয়াটার পার্কের (জলকেলির প্রমোদ উদ্যান) জন্য এই সরকারই নর্মদার জল পাম্প করে সবরমতী ও অন্যান্য নদীতে ফেলছে। এই নরেন্দ্র মোদিই নর্মদা প্রকল্পকে তুরুপের তাস করে গুজরাটের জনগণের মধ্যে গুজরাটিয়ানা তাতিয়ে তুলতে চাইছে।

গত মার্চ মাসে বাঁধের উচ্চতা ১১০.৬৪ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১২১.৯২ মিটার করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে নতুন করে সোরগোল শুরু হয়। বাঁধ উঁচু করা মানেই হল জলাধারের আরও বিস্তৃতি এবং আরও জনপদ জলপ্লাবিত হওয়া। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও যেখানে পুরনো বাস্তুচ্যুতদেরই পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি এবং সরকার যে এ ব্যাপারে পুরোপুরি অনিচ্ছুক একথাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেখানে আবার বাঁধের উচ্চতা ১১ মিটার বাড়ালে নতুন করে যে ৩৫,০০০ পরিবার ভিটেমাটি হারাবে, তাদের কী হবে — এ প্রশ্ন গুরুতররূপে দেখা দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চরম অবহেলাকে সামনে রেখে মেধা পাটকারের নেতৃত্বে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। মার্চ মাসে মেধা পাটকার অনশন করেন। বর্তমানেও প্রথমে গুজরাটে অনশন, গ্রেপ্তার ও মুক্তির পর দিল্লির যন্তরমন্তরের সামনে তিনি অনশন চালাচ্ছেন। তাঁরা বলছেন — ক্ষতিপূরণের জমি সহ সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে বাঁধ তৈরির কাজ যে চলছে তা "বেআইনি" এবং তা "মেনে নেওয়া যায় না।"

নরেন্দ্র মোদির ঘৃণ্য খেলা

চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক বিজেপি-মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘোষণা করা দূরে থাক, বাঁধকে সামনে রেখে জনসাধারণের মধ্যে উগ্র সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক চিন্তা খুঁচিয়ে তুলতে সচেষ্ট। এই উদ্দেশ্যে "বাঁধের কাজ বন্ধ করিয়ে গুজরাটের স্বার্থহানি ঘটানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে" তিনি পাল্টা অনশন করে, পুনর্বাসনের ন্যায্য দাবি থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন।

সুপ্রিমকোর্টের স্ববিরোধিতা

ঘটনাক্রম প্রমাণ করেছে, সুপ্রিমকোর্ট বাঁধের উচ্চতা বাড়াবার অনুমতি দেওয়ার ফলেই সরকার একাজে নামতে পেরেছে। অথচ পুনর্বাসনের প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্ট জনস্বার্থরক্ষার দৃষ্টি নিয়ে নিজস্ব পুরনো রায় অনুযায়ী পুনর্বাসনের বাধ্যবাধকতার প্রশ্নে সরকারকে চাপ দেয়নি। সুপ্রিমকোর্টই আগের রায়ে বলেছিল — বাঁধের উচ্চতা বাড়াবার ছ'মাস আগে অধিগৃহীত জমির তুল্যমূল্য জমি ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে। অথচ সত্যিই তা দেওয়া হয়েছে কিনা তা যাচাই পর্যন্ত না করে সুপ্রিমকোর্ট বাঁধ উঁচু করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। এমনকী অতীতে যখন বাঁধের উচ্চতা ৮৫ মিটার থেকে বাড়িয়ে ৯০ মিটার করা হয়েছিল, তখন যাঁরা বাস্তুচ্যুত ও জমিহারা হয়েছিলেন তাঁদেরও সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়নি — এ অভিযোগও চাপা পড়ে গেল। বকেয়া পুনর্বাসনের দায়িত্ব যে জমতে জমতে পর্বতপ্রমাণ হচ্ছে তাও সোচ্চারে সামনে এল না। মধ্যপ্রদেশ সরকার ইতিমধ্যে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের নামে থোক কিছু নগদ টাকা অনুদান নিতে বাধ্য করার জন্য বাস্তুহারাদের উপর চাপ দিচ্ছিল। সকলেই বোঝেন, নগদ ক্ষতিপূরণ মানেই দুর্নীতির খোলা রাস্তা। এহেন অবস্থায়, যেখানে বছরের পর বছর পুনর্বাসনের কাজ বিন্দুমাত্র এগোচ্ছে না, সেখানে মাত্র তিন মাসে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলে বাঁধ উঁচু করার যে অনুমতি ১৭ এপ্রিল সুপ্রিমকোর্ট দিয়েছে তার ফলাফল সহজেই অনুমেয়। কোর্টের আদেশের পর "১৫ দিনের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে" — এই আশা নিয়ে মেধা পাটকার অনশন ভাঙেন। বাঁধের উচ্চতাবৃদ্ধি সহ সকল নির্মাণকার্য বন্ধ রাখার আবেদন ৮ মে সুপ্রিমকোর্ট নাকচ করে দেয়, যদিও পুনর্বাসনের প্রশ্নে স্পষ্ট কোন নির্দেশ সরকারকে দেওয়া হয়নি। আদালত শুধু এইটুকু বলেছে যে — পুনর্বাসনের কাজ পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী তিন সদস্যের কমিটি করেছেন, সেই কমিটি ৩০ জুনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে। সে যাই হোক, একটি পত্রিকায় ইতিমধ্যেই সঠিকভাবে লেখা হয়েছে — "আদালতের রায় যাই হোক, পুনর্বাসন যে দেওয়া হয়নি, এ সত্য গোপন করা যাবে না। দুঃখের কথা, এই মামলায় ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সত্য বেরিয়ে এসেছে।" (শ্রাবণী চৌধুরীর প্রতিবেদন, ওয়ান ওয়ার্ল্ড সাউথ এশিয়া, ১৩.৫.০৬)

বড় বাঁধ নিয়ে বিতর্ক

আমরা আগেই বলেছি — মেধা পাটকার এবং নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন পুনর্বাসনের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে, কিন্তু জেনে বা না জেনে তারা এমন কিছু বক্তব্য রাখছে যার ফলে বড় বাঁধের বিরুদ্ধে একটা জনমত গড়ে উঠছে। বলা-বাহুল্য, তাদের বাঁধ-বিরোধিতা কট্টর আঞ্চলিকতাবাদকে সুবিধা করে দিচ্ছে। বিজেপি'র মুখপত্র অর্গানাইজার লিখছে — "বাঁধ-বিরোধী গোষ্ঠীর আসল লক্ষ্য পুনর্বাসন নয়, তারা আসলে বাঁধের কাজ বন্ধ করতে চায়।" সেচ, পানীয় জল বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করা উচিত কী না — এ প্রশ্নে বর্তমানে নানা মত দেখা দিয়েছে। সর্দার সরোবর বাঁধেরও পরিকল্পনাগত কোন ত্রুটি আছে কী না, বা তা ঘোষিত লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে কী না — সে নিয়েই কিছু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সুতরাং জনকল্যাণের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিয়ে, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত বিষয়টি বিচার করা দরকার।

যাঁরা বড় বাঁধের পক্ষে তাঁরা মনে করেন, বিপুল জলস্রোতকে সবদিক থেকে কাজে লাগিয়ে সেচ, পানীয় জল, ও বিস্তৃত এলাকায় জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি পেতে হলে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নদীর উপর দৈত্যাকার বাঁধ তৈরিই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ছোট বাঁধ

চারের পাতায় দেখুন

বাঁধ বিতর্ক ঃ চাই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি

তিনের পাতার পর

বড় বাঁধের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু বিকল্প কখনোই নয়। এও ঠিক যে, বড় বাঁধ যেমন বহু উপকার করেছে, তেমন কিছু সমস্যাও আছে। বৃহৎ বাঁধ তৈরি করতে গেলে বহু মানুষকে গৃহচ্যুত-জমিচ্যুত করতে হয়, বনভূমি-কৃষিজমি জলাধারে তলিয়ে যায়। তাছাড়া বাঁধের জলাধারে পলি জমার গুরুতর সমস্যা আছে; রয়েছে নদীর প্রবাহের উপর বাঁধের প্রতিক্রিয়া এবং নদীতীরের ভাঙনবৃদ্ধির সমস্যা। বিশ্বের নানা দেশের বৃহৎ বাঁধকে ঘিরে দেখা দেওয়া সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করে প্যাট্রিক ম্যাক্‌কুলি ''সাইলেন্সড রিভারস, দি ইকোলজি অ্যান্ড পলিটিকস্ অব লার্জ ড্যাম'' বইতে যা লিখেছেন, বৃহৎ বাঁধবিরোধী পরিবেশবিদেরা বড় বাঁধের বিরুদ্ধে বলার সময় তা প্রায়শই উদ্ধৃত করেন। অনেকে প্রায় বেদবাক্যের মতোই উদ্ধৃত করেন। অথচ ওই বইতেই প্যাট্রিক ম্যাক্‌কুলি লিখেছেন — ''স্বচ্ছ জলের নদীতে বাঁধ দিলে পলিজনিত সমস্যা দেখা দিতে শতাব্দী কেটে যায়'', ''পরিকল্পনাকাররা অনেক সময় বাঁধের উপকারিতা বাড়িয়ে বলেন'', ''প্রকল্পে যা যা করার কথা সবগুলি ঠিকমতো করা হয় না''। ম্যাক্‌কুলি বার বার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কথাও বলেছেন। আবার তিনিই দেখিয়েছেন — ''ছোট বাঁধের ব্যর্থতাও কম নয়।'' তিনি বলেছেন, বাঁধের নিরাপত্তাকে অতিরঞ্জিত করে নদীর দুপাশে প্লাবনভূমিতে জনবসতি গড়ে তোলার জন্যও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি বেড়েছে। কাজেই বড় বাঁধ থেকে যেসব ক্ষতি হচ্ছে বলে বলা হয়, বৃহৎ বাঁধই তার একমাত্র কারণ নয়, তার অন্যান্য কারণও আছে — যেগুলি দূর করা যায়। কাজেই বড় বাঁধ মাত্রেই পরিত্যাজ্য — এটা বলা যায় না। বড় বাঁধের পক্ষে-বিপক্ষে সর্বপ্রকার যুক্তি ও সম্ভাবনাকেই খতিয়ে দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বিজ্ঞানসম্মত।

আমাদের দেশে যখন দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা করা হয়, তখন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ভূমিক্ষয় রোধে বনসৃজন করা সহ বেশ কয়েকটি পরিপূরক কাজের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেগুলি করা হয়নি। মেঘনাদ সাহা সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশাল বিশাল বহু উদ্দেশ্যসাধক বাঁধ তৈরির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। (দ্রঃ ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল রিকনসট্রাকশন অ্যান্ড দি সোভিয়েট একজামপল ঃ সিলেকটেড ওয়ার্কস ভল্যুম ২)। দামোদর পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সতর্কবাণী তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তাতে কান দেওয়া হয়নি। পলি তুলে কাজে লাগানোর কর্মসূচি রূপায়িত হয়নি। বিপরীতক্রমে পলি পড়ে পড়ে লকগেটগুলি অর্ধেকের বেশি অকেজো হয়ে গিয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ আদৌ হয়নি। একই সঙ্গে বলা যায়, নানা দেশে বড় বাঁধ যেগুলি অকেজো হয়েছে, তার সঠিক কারণগুলি আগে দেখা দরকার। প্যাট্রিক ম্যাক্‌কুলিই লিখেছেন, পাকিস্তানের সুবিশাল তারবেলা বাঁধ বহু বছর কার্যকর আছে। এককথায় বড় বাঁধ তৈরি অবৈজ্ঞানিক বলার আগে দেখা যাক ম্যাক্‌কুলি কী বলেছেন — ''The unique nature of each dam means that every structure will age at different rate in a different way. Some dams may remain safe for a thousand years, others may start to crack and leak after less than a decade … the numbers and size of the dams reaching their half century is rapidly increasing'' (P. 139)

অর্থাৎ প্রত্যেকটি বাঁধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, কোনটা হাজার বছর অটুট থাকে, কোনটা দশ-বিশ বছরে লিক করতে শুরু করে। তবে ৫০ বছরের বেশি আয়ু পাচ্ছে এমন বড় বাঁধের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এই অভিজ্ঞতাই বলে দেয় — প্রত্যেকটি বাঁধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই সঙ্গত। মেঘনাদ সাহা দেখিয়েছেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯৩০-এর দশকে এভাবেই বিচক্ষণতার সাথে কাজ করা হয়েছিল। একপেশে বা পূর্বধারণা থেকে মুক্ত হয়ে বিশেষ প্রকল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, না হলে পরিবেশরক্ষার নামে 'গ্রামে ফিরে যাও' মানসিকতা পেয়ে বসবে।

ঝোঁক মুক্ত বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি চাই

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি, বড় বাঁধের তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বড় ধরনের হস্তক্ষেপের পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি রয়েছে। একদল পরিবেশবিদ মনে করেন, পরিবেশের উপর মানুষের বড় আকারের হস্তক্ষেপ ঘটলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং বিপর্যয় দেখা দেয়। আবার আর একদল মনে করেন, কোনরকম হস্তক্ষেপ না ঘটলেও প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেও যে পরিবর্তন ঘটে তা কখনো কখনো মানুষের পক্ষে বিপর্যয়কর হয়ে থাকে। প্রথম দলের পরিবেশবিদরা প্রকৃতির উপর বেপরোয়া হস্তক্ষেপ বলতে যদি বনবিনাশ, বায়ুদূষণ, বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন, কারখানার বর্জ্য দ্বারা নদীদূষণ, অপরিমিত জ্বালানি তেল পোড়ানো, মারাত্মক পারমাণবিক বর্জ্য ছড়ানো — এগুলি বোঝান তবে তা নিশ্চয় বন্ধ করা দরকার। একটু গভীরে ঢুকলে দেখা যাবে অজ্ঞতা নয়, মুনাফার স্বার্থ এবং মুনাফার স্বার্থে প্রচারিত বেপরোয়া ভোগবাদ — অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মের অনিবার্য পরিণতিতেই প্রাকৃতিক সম্পদের বেপরোয়া লুণ্ঠন পরিবেশের বিপর্যয়কে ডেকে আনছে। তাই পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামের পরিপূরক করে গড়ে না তুললে সে লড়াই পরিবেশকে বাঁচাতে পারবে না। পরিবেশরক্ষার আন্দোলনকে পুঁজিবাদবিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে পৃথক করে অরাজনৈতিক চরিত্র দিলে তা সমাজের প্রতিবাদী চেতনা ও প্রতিবাদী মানুষ এবং তাদের মধ্যে নিহিত বিপ্লবী শক্তিকে নিছক পরিবেশ সমস্যার মধ্যে বেঁধে ফেলে পুঁজিবাদকে চোখের আড়াল করে দেবে। তাই অরাজনৈতিক পরিবেশ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষা, কোনটাই করতে পারবে না। প্রাকৃতিক নিয়মের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াও পরিবেশকে মানবসভ্যতার অনুকূলে নিয়ে আসবে না। খরা, বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস — স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলি ঘটতে থাকলে হাত গুটিয়ে বসে থেকে মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মকে জেনে, সেই নিয়মকে কাজে লাগিয়ে, প্রাকৃতিক সম্পদকে জীবনের অনুকূলে এনে গড়ে উঠেছে সভ্যতা। স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক নিয়মে বীজ থেকে গাছ হয়, কিন্তু কৃষি হয় না; খালি হাতে শিকার হতে পারে, কিন্তু পশুপালন হয় না। ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘোরানো যায় না। ''গ্রামে ফিরে যাও'' বললেই শহরগুলি, বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি উবে যেতে পারে না। নদীর প্লাবনভূমিতে বা চড়াতে বসবাস করো না বললে, মানুষ তা ছেড়ে যেতে পারে না। সেজন্য সরকারি ব্যবস্থা চাই, বিপর্যয়রোধে পূর্বাহ্নে সতর্কীকরণ ও উপযুক্ত আশ্রয় চাই। সকলেরই মনে আছে, ওড়িশার জগৎসিংপুরে সুপার সাইক্লোনে, বিশেষভাবে নির্মিত সাইক্লোন শেল্টারে যাঁরা আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁরা বেঁচেছিলেন, কিন্তু শেল্টার ছিল অনেক কম।

প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপের লক্ষ্য যদি মানবকল্যাণ হয় তবে বিচক্ষণতার সঙ্গে তা করা দরকার। কিন্তু তার লক্ষ্য যদি মুনাফা বা রাজনৈতিক ফয়দা লোটা হয়, তবে তা প্রতিরোধ করা দরকার। কোন অবস্থাতেই বাস্তুহারা ও জমিচ্যুতদের পুনর্বাসনের প্রশ্নকে অবহেলা করা চলে না। কাজেই বাঁধের কাজ এবং পুনর্বাসনের কাজ একই সঙ্গে করতে হবে, তাছাড়া বাঁধের পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা আছে কী না তা খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

পরিকল্পনার ত্রুটি

কিছু বিশেষজ্ঞ বিশাল সর্দার সরোবর বাঁধের পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগত দিক বিচার করে প্রশ্ন তুলেছেন, এই বাঁধ জনগণের কতটুকু কাজে লাগবে? গোড়ায় বলা হয়েছিল, জলাধারে কমবেশি ২.৭২ কোটি একর ফুট জল ধরা থাকবে। পরে বলা হয়েছে, জল ধারণ ক্ষমতা ১৭ শতাংশ কম হবে। গোড়ায় বলা হয়েছিল, গুজরাট পাবে ৯০ লক্ষ একর ফুট জল। পরে বলা হচ্ছে, জল কম হবে এবং ঘাটতির কোপটা পড়বে খরাপীড়িত কচ্ছ-সৌরাষ্ট্র এলাকায়। বৃহৎ বাঁধ সম্পর্কিত ওয়ার্ল্ড কমিশন বলেছে, ভারতে যা ক্যানেল আছে তা জলাধারের মাত্র ৪০ শতাংশ জল বহন করতে পারে। ফলে, সর্দার সরোবরের জল দিয়ে কচ্ছ, সৌরাষ্ট্রের প্রয়োজন মিটিয়ে রাজস্থানের সেচের কাজ হবে — এমন দাবি কতটা বাস্তব? কিছু বিশেষজ্ঞ নর্মদার ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টিপাত ও জলাধারের ক্ষমতার তুলনা করে বলেছেন, চারপাঁচ দিন ভারী বর্ষণ হলে জলাধার থেকে জল ছাড়া ব্যতীত কোন পথ থাকবে না। পরিণামে ভারুচ শহর ও সংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হবে। জাতীয় জলনীতি ২০০২-তে বলা হয়েছে, প্রকল্পের খরচের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জলের দাম নির্ধারণ করা হবে। প্রকল্পের অনুমিত খরচ হল, ৬৭,২৫০ কোটি টাকা। প্রশ্ন হল — জলের দাম যা ধরা হবে, তা গরিব মানুষ দিতে পারবে কি? নাকি কেবল ধনীরা, ... শিল্পমালিক ও ধনী কৃষি পুঁজিপতিরাই নর্মদার জল ব্যবহার করতে পারবে? (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫-৪-০৬)

দেখা যাচ্ছে, বাঁধ বড় হবে, না ছোট হবে সেটা প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হল — সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে কার্যকরী কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে কী না। ইতিমধ্যেই বাঁধ নির্মাণে ২০,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, এখন মধ্যপথে সেই বাঁধ বাতিল করাই বা সম্ভব কি? ফলে জনস্বার্থ, বিশেষত খরাপীড়িত জনগণের স্বার্থকে সামনে রেখে, দ্রুততা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বাঁধের কাজ শেষ করা দরকার এবং সর্বাগ্রে দরকার উচ্ছেদ হওয়া মানুষের সুষ্ঠু পুনর্বাসন। বাঁধের উচ্চতা বাড়াবার আগে পূর্বতন জমিচ্যুত এবং বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে হবে। অথচ বাস্তবে নরেন্দ্র মোদি পুনর্বাসনের সবচেয়ে জরুরি কর্তব্যটি পিছনে ঠেলে দিয়ে, উগ্র সঙ্কীর্ণতাকে উস্কে রাজনৈতিক স্বার্থ গোছাতে চাইছে। কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার গালভরা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কার্যত মোদির হাতকেই শক্ত করছে। আর সিপিএম-সিপিআই মুখে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের দাবি, অর্থাৎ পুনর্বাসনের দাবি উচ্চারণ করতে করতেই কেন্দ্রীয় সরকারের পিছনে দাঁড়াচ্ছে। কিছু এন জি ও এবং অন্যান্য শক্তি বাস্তুহারাদের স্বার্থের কথা বলতে বলতেই বড় বাঁধ বনাম ছোট বাঁধের বিতর্ককেই প্রধান ইস্যু করে তুলছে। পরিবেশ রক্ষার নামে বাঁধবিরোধী প্রচারের দ্বারা পাল্টা সঙ্কীর্ণতাবাদী প্রচারকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করছে।

এস ইউ সি আই-এর দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা দাবি করেছি — ইতিমধ্যেই উচ্ছেদ হওয়া সকলকে যথার্থ পুনর্বাসন সর্বাগ্রে দিতে হবে এবং বাঁধের উচ্চতা বাড়াবার আগে, উচ্চতাবৃদ্ধির জন্য নতুন করে যাঁরা সব হারাবেন তাদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাবি করেছি — একখণ্ড জমি দিয়েই পুনর্বাসনের দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না। কেবল বাস্তুচ্যুতদেরই নয়, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে উপযুক্ত জীবিকার সুযোগ পায়, কোনদিক থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষতি যেন তাদের না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণকে কেন্দ্র করে সবরকম দুর্নীতিকে কঠোর হাতে অবিলম্বে দমন করতে হবে। বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট নাগরিক, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে যুক্ত করে, তাদের মতামত নিয়ে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাঁধের বাকি কাজ শেষ করতে হবে। আমরা এও বলেছি — বাঁধ সংক্রান্ত প্রশ্নকে কাজে লাগিয়ে সঙ্কীর্ণতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি যাতে কোনভাবেই ফয়দা তুলতে না পারে, সে ব্যাপারে জনগণকে সদাসতর্ক থাকতে হবে।

স্বাধীনতার ৫৯ বছর পরে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান অভাবনীয় অগ্রগতির যুগে জনসাধারণ খরায়-বন্যায় মরবে, প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকবে কিংবা শাসকদলের কলমের এক খোঁচায় ঘর-বাড়ি, জীবন-জীবিকা সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসবে — এ জিনিস কোনমতেই চলতে পারে না।

বর্ধমান

বকেয়া বেতনের দাবিতে হিন্দুস্তান কেব্‌ল্‌সে শ্রমিক আন্দোলন

হিন্দুস্তান কেব্‌ল্‌স্ লিমিটেডের কর্মীরা দীর্ঘ ১০ মাস বেতন পাচ্ছেন না। শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-অসুস্থ পরিজন নিয়ে তাঁরা এক চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচ মাসের বেতন পাঠিয়েছে। কিন্তু এখানকার কর্তৃপক্ষ সেই টাকা আটকে রেখেছে। এদিকে কর্তৃপক্ষ বলছে, ৫৮ বছরের বেশি বয়সের শ্রমিকদের জন্য কোন বেতন আসেনি। অথচ এখানে শ্রমিকদের অবসরের বয়স বরাবর ছিল এবং এখনও আছে ৬০ বছর।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত হিন্দুস্তান কেব্‌ল্‌স্ লিমিটেড মেন্‌স্ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আশঙ্কা করছেন যে, সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এভাবে একটা চাপ সৃষ্টি করে, স্থানীয় ইউনিয়নগুলিকে দিয়ে অবসরের বয়স ৫৮ করার নতুন চুক্তি করতে চাইছে। এটা করাতে পারলে এই মুহূর্তে কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই আটান্ন উর্ধ্ব শ্রমিকরা বরখাস্ত হবেন, শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ভি আর এস নিতে বাধ্য করা যাবে, ভি আর এস চালু করলে ছাপ্পান্ন-উর্ধ্ব শ্রমিকদের ২ বছরের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, সমস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কমে যাবে।

সরকারের এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে মেন্‌স্ ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১৫ জুন কারখানার গেটে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ সমস্ত শ্রমিকদের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানোর সাথে সাথে বলেন যে, কোন বিদেশি সংস্থা নয়, একমাত্র বিএসএনএল-এর সাথে সংযুক্তিকরণের দ্বারাই হিন্দুস্তান কেব্‌ল্‌স্ লিমিটেডকে বাঁচানো সম্ভব।

বীরভূম

নলহাটীতে ডেপুটেশন

বিপিএল তালিকার অসঙ্গতি দূরীকরণ, ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করা সহ এলাকার বিভিন্ন দাবিতে এস ইউ সি আই-এর স্থানীয় কমিটিগুলির উদ্যোগে নলহাটী ১নং ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন সংগঠিত হয়।

লাভজনক পদ

ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত সরকারি দলগুলির মহাজোট

'অফিস অফ্ প্রফিট' বা লাভজনক পদ সংক্রান্ত বিতর্কের যে ঝড় উঠেছিল, তাকে ধামাচাপা দেবার পাকা ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন দেশের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ। কিন্তু বাদ সেধেছেন রাষ্ট্রপতি।

গত ১৯ মে মূল আইনের উপর সংশোধনী লোকসভায় পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। লাভজনক পদ হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ৫৫টি পদকে 'প্রিভেনশন অফ্ ডিসকোয়ালিফিকেশন আইনে'র (১৯৫৯ সালে তৈরি মূল আইন) বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সংশোধনীর মারফত। অতএব, ঐ পদগুলিতে এখন যেসব সাংসদ রয়েছেন বা ভবিষ্যতে যাঁরা বসবেন তাঁদের মূল আইনের জোরে সাংসদপদ বাতিলের প্রশ্ন তোলা যাবে না। চমৎকার পাকা ব্যবস্থা সন্দেহ নেই! কিন্তু হঠাৎ রাষ্ট্রপতি এই সংশোধনীতে আপত্তি তুলেছেন এবং এই বিলটির কিছু দিকের ব্যাখ্যা চেয়ে তা আবার সরকারের কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন। এই ঘটনায় আবার কিছুটা সোরগোল পড়ে যায়। কারণ, রাষ্ট্রপতি হিসাবে আব্দুল কালাম বিলক্ষণ জানেন, তাঁর এই ব্যাখ্যা চাওয়ার দ্বারা ঐ বিলকে আইনে পরিণত হওয়া থেকে আটকানো যাবে না। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী লোকসভায় পাশ হওয়া কোনও বিলের ব্যাখ্যা চেয়ে রাষ্ট্রপতি একবার তা ফেরত পাঠাতে পারেন, কিন্তু লোকসভায় যদি দ্বিতীয়বার পাশ হয়ে যায়, তবে তা মেনে নিয়ে সেই বিলে অনুমোদনের সীলমোহর দিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য। তবুও এভাবে কোনও বিল রাষ্ট্রপতি ব্যাখ্যা চেয়ে ফেরত পাঠালে, সেই ঘটনার রাজনৈতিক গুরুত্ব বড় হয়ে যায়। লোকসভার ও বিধানসভার সদস্যরা কোনও লাভজনক পদে থাকলে তাঁর সাংসদ বা বিধায়ক পদের যোগ্যতা হারাবেন — মূল আইনের এই ধারাকে কেন্দ্র করে এবার যে বিতর্ক ওঠে, প্রথম থেকেই তার সাথে রাষ্ট্রপতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যেসব সাংসদদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে, তাঁদের সাংসদপদ খারিজ করার আবেদন নিয়মমতো রাষ্ট্রপতির কাছেই গিয়েছে। এই অবস্থায় সাংসদরা যেভাবে নিজেদের আসন বাঁচিয়ে নানা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদগুলি দখলে রাখার জন্য তড়িঘড়ি আইন সংশোধন করে নিলেন, তার মধ্যে নীতিহীনতা অত্যন্ত নগ্নভাবে ধরা পড়ার ফলেই হয়তো রাষ্ট্রপতি আপত্তির কথা নোট করিয়ে নিজের অবস্থানকে একটু আলাদা করে দেখাতে চেয়েছেন। তবে রাষ্ট্রপতির এই আপত্তি আইন অনুযায়ী ধোপে না টিকলেও তাঁর বার্তাটি কিন্তু লোকসভা সদস্যদের বা তাদের দলগুলির নেতাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার, অবশ্য তাদের মধ্যে লজ্জা নামক মানবিক বস্তুটির যদি কিছু আর অবশিষ্ট থেকে থাকে। তার কিছুই যে আর অবশিষ্ট নেই, তারও প্রমাণ দিয়ে সাংসদরা স্থির করেছেন যে, লোকসভার বাদল অধিবেশনে তাঁরা বিলটি দ্বিতীয়বার পাশ করিয়ে রাষ্ট্রপতির আপত্তি নস্যাৎ করে দেবেন। এরপরই রাষ্ট্রপতি এই প্রশ্নে পদত্যাগের হুমকি দিয়ে সাংসদদের বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন।

এই লাভজনক পদ সম্পর্কে সংবিধানের ১০২/১/ক ধারায় এম পি বা সাংসদদের জন্য ও ১৩১/১/ক ধারায় এম এল এ বা বিধায়কদের জন্য বলা আছে — কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে যেসব পদগুলিকে সংসদ বা কোনও রাজ্যের বিধানসভা লাভজনক বলে ঘোষণা করেনি, একমাত্র সেইসব পদেই সাংসদ বা বিধায়করা থাকতে পারবেন, অন্য কোন পদে থাকলে তিনি সাংসদ বা বিধায়ক থাকার যোগ্য নন বলে বিবেচিত হবেন। সংবিধানের এই নির্দেশানুযায়ী ১৯৫৯ সালে প্রিভেনশান অফ ডিসকোয়ালিফিকেশন আইন তৈরি করা হয়। ঐ আইনে কিছু পদকে লাভজনক পদের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। পরবর্তী ৪৫/৪৬ বছরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীনে আরও বহু সংস্থা হয়েছে, যার অনেক পদেই সাংসদ ও বিধায়করা আছেন। এমন ঘটাই স্বাভাবিক। তাই সংবিধানের ১০২ ধারায় লাভজনক পদ কোনগুলিকে বলা হবে, তার একটা সংজ্ঞাও দেওয়া হয়েছিল এবং কেন এই বিধান রাখা হচ্ছে তার ব্যাখ্যাও সেখানে আছে। লাভজনক পদ বলতে আর্থিক লাভকে বোঝানো হয়নি। প্রথমত, দেখা হয়েছে, যাতে সাংসদ ও বিধায়করা এমন কোন পদে না থাকতে পারেন, যে পদের প্রশাসনিক ক্ষমতা আছে। মনে করা হয়েছে, সাংসদ ও বিধায়করা কোনও প্রশাসনিক পদে থেকে শাসন- বিভাগের অঙ্গ হয়ে পড়লে, শাসন- বিভাগের অর্থাৎ সরকারের ভুলত্রুটি, অন্যায়, জনবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে পারবেন না বা করবেন না।

দ্বিতীয়ত, আইনসভার সদস্য হিসাবে আইন তৈরির ক্ষেত্রে একজন সদস্যের যে শাসনবিভাগ-নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়ার কথা, সরকারি সংস্থার বা সরকারের সাথে সম্পর্কিত সংস্থার কোন পদে থাকলে সেই ভূমিকা বাধাপ্রাপ্ত হবে, তিনি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। সংবিধানের এই ব্যাখ্যা থেকেই বোঝা যায়, লাভজনক পদ কাকে বলা যাবে, তার একটা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অতএব যাঁরা বলছেন, সংবিধানে লাভজনক পদের কোনও সংজ্ঞা দেওয়া নেই, তাঁরা কি ঠিক বলছেন?

কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরে নানা সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থায় নানা শীর্ষপদে এম পি, এম এল এ-দের নিযুক্ত করাকে এদেশে একটা রেওয়াজে পরিণত করা হয়েছে। প্রায় সকল সংসদীয় দলের ক্ষেত্রেই এই রেওয়াজ সুবিধা বিতরণের হাতিয়ার হয়েছে। এমন ঘটনা আকছার দেখা যাচ্ছে যে, যাকে কেন্দ্রে বা রাজ্যের সরকারে মন্ত্রীত্ব দেওয়া গেল না, তাকে কোন সংস্থার কর্তা করে দেওয়া হল, যাতে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে না যান। ফলে সংবিধান প্রণেতারা যে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে এই বিধান এনেছিলেন, তাকে কবরে পাঠিয়ে এখন এম এল এ/এম পিদের জন্য প্রাইজপোস্ট হিসাবে সরকারি সংস্থার পদ বিতরণ করা হচ্ছে, যা শুধু ক্ষমতার অর্থেই লাভজনক নয়, অর্থকরী লাভও যেখানে বিপুল।

তাই আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে শাসক ও বিরোধী সব দলই কেমন ভোজবাজিতে এক হয়ে গেল। এমনই 'মহাঐক্যে'র দৃশ্য আরও একবার দেখা গিয়েছিল শ্রী চন্দ্রশেখরের প্রধানমন্ত্রীত্বের শেষ দিনটিতে। এম পিদের জন্য পেনশন আইনে সংশোধনী আনতে ঐদিন লোকসভা-রাজ্যসভার একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। ১ বছরের জন্য কেউ এম পি পদে থাকার সুযোগ পেলেই পেনশন পাওয়ার অধিকারী হবেন, এই মর্মে একটি সংশোধনী বিল গ্রহণ করা হয়েছিল ঐ বিশেষ অধিবেশনে। একজন এম পি-ও অনুপস্থিত ছিলেন না এবং সকল দলের সকল এম পি একযোগে ঐ সংশোধনীকে সমর্থন করেন, কোনও বিরোধিতা দেখা যায়নি। ঐ অধিবেশনের পরই লোকসভা ভেঙে দেওয়া হয়, নতুন নির্বাচন হয়।

তাছাড়া দেখা গেছে, দেশের মানুষ খেতে পাক না পাক বিভিন্ন সময়ে এম পি, এম এল এ-দের নানা ধরনের ভাতা ও সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির প্রস্তাব যখনই উত্থাপিত হয়, সরকারি ও সরকারবিরোধী দলগুলির সদস্যদের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের ঐক্য দেখা যায়।

এই যখন দেশের 'জনপ্রতিনিধিদের' নৈতিক মান, তখন হঠাৎ লাভজনক পদের বিতর্কটি ওঠারই কথা ছিল না। আসলে উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম সিং যাদব ও অমিতাভ বচ্চন পরিবার — এই দুটি টার্গেটকেই এক ঢিলে কোণঠাসা করার কৌশল হিসাবে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও কংগ্রেস দল ১৯৫৯ সালের ঐ আইনটিকে ব্যবহার করতে উদ্যত হন। বেনামে অন্য এক ব্যক্তিকে দিয়ে তাঁরা অভিযোগ তোলেন যে, সমাজবাদী পার্টির ভোটে রাজ্যসভায় নির্বাচিত জয়া বচ্চন উত্তরপ্রদেশের চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগমের চেয়ারপার্সন পদে রয়েছেন, যেটি লাভজনক পদ। ১৯৫৯ সালের আইনের আওতায় রাষ্ট্রপতির কাছে অভিযোগ যায় এবং জয়া বচ্চনের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যায়। এরপরই মুলায়ম সিং সরাসরি সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, সোনিয়াজিও জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদের চেয়ারপার্সন, একই আইনে তিনি লোকসভার সদস্য থাকেন কী করে? এই থেকেই জল ঘোলা হতে শুরু করে। স্পিকার সিপিএম নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জী থেকে শুরু করে প্রায় সকল দলের বহু সাংসদকে নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়, কংগ্রেস সহ সব দলই বেকায়দায় পড়ে। সোনিয়া গান্ধীর জন্য সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে কংগ্রেস। সেসময়ই উক্ত আইনের আওতা থেকে অভিযুক্ত সাংসদদের পদগুলিকে বাদ দেওয়ার জন্য পাল্টা আইন পাশ করিয়ে নেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। লোকসভার বাজেট অধিবেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সিপিএম-কংগ্রেস সহমতের ভিত্তিতে লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। সংবাদ ছড়িয়ে যায়, সোনিয়া গান্ধীকে বাঁচাতে কংগ্রেস আর দেরি না করে অর্ডিন্যান্স আনবে বলেই অধিবেশন মুলতুবি করিয়েছে। কিন্তু তড়িঘড়ি আইন পাল্টে সোনিয়া গান্ধীকে অভিযোগ থেকে বাঁচাতে গেলে, দেশজুড়ে ছিঃ ছিঃ শুরু হবে এবং কংগ্রেসের আত্মরক্ষার কোনও যুক্তি থাকবে না। অতএব, সবদিক বজায় রাখতে হঠাৎ সোনিয়া গান্ধী সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করে নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা দেখান। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম তাঁর গুণকীর্তনে মেতে ওঠে। অন্যদিকে পরিকল্পনা মতোই রায়বেরিলি কেন্দ্রে বিশেষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং তিনি রেকর্ড ভোটে জিতে আবার এম পি হয়ে গেছেন। সন্দেহ নেই, জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদের চেয়ারপার্সনও তিনিই হবেন।

কংগ্রেসের শুধু সোনিয়া গান্ধীই নন; করুণ সিং, টি সুব্বারামা রেড্ডির বিরুদ্ধেও লাভজনক পদ আঁকড়ে থাকার অভিযোগ উঠেছিল। কংগ্রেস কেন এদের পদত্যাগ করালো না? আসলে সোনিয়া গান্ধীর পদত্যাগের মধ্যে কোন নৈতিকতা ছিল না, ওটা ছিল তার রাজনৈতিক চাল মাত্র। সিপিএম সাংসদ তথা লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ, তিনি শান্তিনিকেতন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া সিপিএমের মহঃ সেলিম, হান্নান মোল্লা, সুজন চক্রবর্তী, সুধাংশু শীল, অমিতাভ নন্দী, তড়িৎ তোপদার সহ আরও ১৭ জন সাংসদ লাভজনক পদে থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত। বিজেপি সাংসদ ভি কে মালহোত্রার বিরুদ্ধেও অভিযোগ, তিনি সারা ভারত ক্রীড়া পরিষদে যুক্ত ছিলেন। ঝাড়খণ্ডে, যেখানে বিজেপি খুব সামান্য গরিষ্ঠতায় মন্ত্রীসভা গঠন করেছে সেখানে বিধায়কদের সমর্থন জড়ো করতে বিজেপি গণ্ডায় গণ্ডায় এম এল এদের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পদ দিয়েছে। অতএব সব দলেই ত্রাহি ত্রাহি রব! তাই রাতারাতি এই প্রশ্নে কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম এক হয়ে গেল।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্মেষের যুগে 'আইন নিজের পথেই চলবে', বা 'আইনের চোখে সকলেই সমান' এই গণতান্ত্রিক ধারণাগুলির উদ্ভব হয়েছিল। ব্যক্তির স্বৈরশাসন নয়, আইনের শাসন এসেছিল। আজ সেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চরম অবক্ষয়ের যুগে আইনসভার সদস্যরাই তা লঙ্ঘন করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, যে আইনের দ্বারা উক্ত সাংসদ-বিধায়করা অপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত সেই আইনকেই সংশোধনের নামে প্রয়োজনমতো পাল্টে দিয়ে তাঁরাই প্রমাণ করে দিলেন, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে এখন 'আইন তার নিজের পথেই চলবে' কথাটি কত অন্তঃসারশূন্য। এক্ষেত্রে আইন নিজের পথে চললে যেহেতু সাংসদ-বিধায়করা বিপন্ন হচ্ছেন, সেহেতু সকল দলের সাংসদরা একজোট হয়ে সংবিধান সংশোধন করে তাদের অধিকৃত পদগুলি অলাভজনক তালিকায় ঢুকিয়ে দিলেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় একে নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ ছাড়া আর কী বলা যায়! এভাবে ৫৫টি পদ অলাভজনক তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল, যার মধ্যে ১৮টিই পশ্চিমবঙ্গের। অর্থাৎ মনমোহন সিংয়ের গদি বাঁচাতেই সিপিএমের সব অভিযুক্তদের খালাসের ব্যবস্থা করা হল। বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার এই ক্লেদাক্ত রূপ দেখিয়ে দেয়, এর মধ্যে আজ আর ভাল কিছু পাওয়া যাবেনা। সংসদ কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের লাভের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। লাভ ও লোভের মানসিকতা এত উৎকট রূপ নিয়েছে যে, এই ধরনের নীতিহীন রাজনৈতিক সুবিধাবাদের সাফাই গাইতে গিয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হংসরাজ ভরদ্বাজ বলেছেন, "শান্তিনিকেতন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। তাই কোন এমপি শান্তিনিকেতন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে থেকে কাজ করলে তা দেশসেবার সমান বলেই আমরা মনে করি।" প্রশ্নটা এক্ষেত্রে শান্তিনিকেতন বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা নিয়ে ওঠেনি। মূল প্রশ্ন হল, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে একজন এমপি বা এমএলএ-কেই থাকতে হবে কেন? দেশে কি আর কোন যোগ্য ব্যক্তি নেই? আইনমন্ত্রীর জবাবে বলতে হয়, শান্তিনিকেতন উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান না হলে কি স্পিকার মহাশয়ের দেশসেবা আটকে যাবে?

এমএলএ, এমপি-দের কাজ কী? এ সম্পর্কে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, জনপ্রতিনিধিদের দরকার নিরন্তর জ্ঞানচর্চা, যাতে মনন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁরা জাতিকে ঠিকপথে চালিত করতে পারেন। তিনি লিখেছেন, তাঁদের এই অনুশীলন ও কর্মব্যস্ততার ফলে তাঁরা অন্যদিকে মনই দিতে পারবেন না। সংসদীয় ব্যবস্থার গোড়ার দিকে এই যে ভাবনার উদ্ভব হয়েছিল তার সঠিক পরিণতি বুর্জোয়া ব্যবস্থায় হতে পারে না। কারণ, শোষণমূলক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় বুর্জোয়াদের স্বার্থের বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিদের যাওয়ার ক্ষমতা নেই।

বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পদ আঁকড়ে থাকতে কেন এত তৎপরতা? সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের অধ্যাপক রবার্ট ওয়াদে লিখেছেন, রাজনৈতিক নেতা এবং আমলাতন্ত্রের এক দুষ্টচক্র লাভজনক পদগুলিকে একটা বড় ব্যবসা হিসাবে দেখছে এবং তা আঁকড়ে থাকার জন্য যেকোন পথই অবলম্বন করছে। কারা এই রাজনৈতিক নেতা? কারা মূলত এমএলএ, এমপি হচ্ছে? হায়দরাবাদের 'লোকসত্তা' নামে একটি সংস্থা গবেষণা চালিয়ে দেখেছে, রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণত ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নির্বাচনে দাঁড় করায় যাতে তারা নিজেরাই প্রচুর টাকা ঢালতে পারে। 'সি এস ডি এস' নামে একটি সংস্থা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছে, এদেশে নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের ৬৭ শতাংশই উচ্চবিত্ত, বড় ব্যবসায়ী এবং বৃহৎ জমির মালিক। এরাই টাকার জোরে ভোট কিনে মিডিয়াকে প্রভাবিত করে ও মাফিয়াদের ব্যবহার করে নির্বাচনে জেতে। নির্বাচনে চলে কালো টাকার খেলা। 'ট্রান্সপারেন্সি ইনটারন্যাশনালে'র হিসাবে ভারতে ১০০ হাজার কোটি কালো টাকার মধ্যে ৬০ হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে খরচ হচ্ছে। লোকসত্তা দেখিয়েছে, নির্বাচনে প্রার্থীরা যা খরচ

ছয়ের পাতায় দেখুন

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঃ গণশক্তির ছেঁদো যুক্তি

কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার দু'বছরের মধ্যে এবার নিয়ে ছ'বার পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ালো। সিপিএম এই দামবৃদ্ধিকে 'অযৌক্তিক' আখ্যা দিয়ে দেশজুড়ে আন্দোলনের হুঙ্কার দিচ্ছে। যাদের সমর্থনের উপর ভর করে কেন্দ্রের সরকারটি টিকে আছে তাদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে কেন্দ্রের পক্ষে দাম বাড়ানো যে সম্ভব নয় এবং বস্তুত সিপিএম সহ 'বাম' নামধারী দলগুলির সম্মতি পাওয়ার পরেই যে জ্বালানি তেলের দাম এবার বাড়ানো হয়েছে, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মুরলী দেওরার মুখ থেকে এ'কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর আন্দোলনের নামে এভাবে গরম গরম স্লোগানসর্বস্ব নাটকের অভিনয় করা ছাড়া সিপিএম-এর অন্য কোন উপায়ও নেই।

এটি নতুন কোনও ব্যাপার নয়, গত পাঁচবার যখনই পেট্রলের দাম বেড়েছে, সিপিএম ও তার সহযোগীরা এ জিনিসই করেছে। এবারও তাই ঘটেছে। তবে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের চাপানো কর নিয়ে তারা খুব সরব ভাব দেখাচ্ছে। অথচ এস ইউ সি আই যখন প্রথম দেখায় যে, কেন্দ্র ও রাজ্যের বিপুল করের জন্যই এদেশে পেট্রল-ডিজেলের এত দাম, তখন সিপিএম নেতারা তাতে কর্ণপাত করেননি। আজ যখন এই বিপুল দামবৃদ্ধির আসল কারণটা জনগণ ধরে ফেলেছে, তখন সিপিএম নেতারা লোকদেখানো প্রতিবাদের নাটক করছেন।

সিপিএমের এই দ্বিচারিতা বেশি বেশি করে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে দেখে তাদের দলের মুখপত্র 'গণশক্তি' (১৯-৬-০৬) আত্মপক্ষ সমর্থনে একটা সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। তাদের দলের প্রতিবাদকে 'লোকদেখানো' বলায় ক্ষুব্ধ গণশক্তি লিখেছে, ''বামপন্থীদের চাপের মুখে বর্তমান সরকার নিজেদের ইচ্ছামতো দাম বাড়াতে পারেনি।'' তাহলে একথার মানে তো এটাই দাঁড়ায় যে, দাম যা বেড়েছে তা সিপিএমের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাড়ানো হয়েছে। নিশ্চয়ই তাই। সিপিএমের সমর্থনপুষ্ট কংগ্রেস সরকার মাত্র ২ বছরের শাসনে এই নিয়ে ৬ বার দাম বাড়ালো, এবং সামগ্রিক বৃদ্ধির পরিমাণ পেট্রলে ৩০ শতাংশের বেশি, ডিজেলে ৪০ শতাংশ। মাত্র ২ বছরে এই পরিমাণ বৃদ্ধি যদি তাদের 'ইচ্ছামতো' হয়ে থাকে তবে তারা আবার লোক দেখানো আন্দোলনের নাটক করছে কেন?

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির তুলনায় জ্বালানি তেল থেকে অনেক বেশি পরিমাণে কর আদায় করে; ২০০৫-০৬ সালে জ্বালানি তেল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব বাবদ পেয়েছে ৭৭,৮০০ কোটি টাকা এবং সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি পেয়েছে ৪৮,৮০০ কোটি টাকা — এই যুক্তি তুলে গণশক্তিতে সিপিএম দাবি করেছে যে, কর কমিয়ে পেট্রল-ডিজেলের দাম কমাবার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণা উল্লেখ করে গণশক্তি বলেছে, কেন্দ্র যেদিন তাদের করের পরিমাণ কমাবে সেদিনই ত্রিপুরা ও কেরালা সহ পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার জ্বালানি তেলের উপর থেকে বিক্রয়কর কমাবে। কী নির্লজ্জ যুক্তিধারা!

এই বক্তব্যের দ্বারা গণশক্তি স্বীকার করে নিল যে, পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার চাইলেই পেট্রল-ডিজেলের উপর তাদের চাপানো বিক্রয়কর কমাতে পারে, কিন্তু কমাবে না।

তাদের সরকার যদি প্রকৃতই জনদরদী হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার কর কমাবে কি কমাবে না, তার উপরে রাজ্য সরকারের নিজস্ব বিক্রয়কর কমানোর সিদ্ধান্ত নির্ভর করার কথাই নয়। কারণ, পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি কীভাবে স্তরে স্তরে অন্যান্য সকল পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় এবং তার ফলে কর-দরের ভারে বিপর্যস্ত গরিব ও মধ্যবিত্ত জনগণের জীবন আরও কত দুর্বিষহ হয়, তা সিপিএম নেতারা বিলক্ষণ জানেন। আগে 'কেন্দ্র পথ দেখাক' বলে যে অজুহাত তাঁরা দিচ্ছেন, তার অর্থ দাঁড়ায় — কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার জনদরদের পরিচয় দিলে তবেই সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ বিক্রয়কর কমিয়ে জনদরদ দেখাবে, না হলে নয়। গণশক্তি এও লিখেছে যে, কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে তারা সজাগ এবং তারা জানে যে, কংগ্রেসও বিজেপি'র মতোই উদারনীতির সমর্থক। একথা বলার দ্বারা গণশক্তি বুঝিয়ে দিল যে, কংগ্রেস সরকার কর কমাবে না — একথা ভালোমত জেনেই সিপিএম ঐ খাসা অজুহাতটি খাড়া করেছে। সিপিএমের চতুর নেতারা মনে করেন, তাঁদের এই ধূর্ত কৌশল জনগণ ধরতে পারবে না। কিন্তু জনগণ বোকা নয়, তারা সবই ধরতে পারছে।

গণশক্তি যুক্তি দিয়েছে, ''পশ্চিমবঙ্গে তেলের উপরে বিক্রয়করের হার অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের চেয়ে অনেক কম।'' শুধু ঐ দু'টি রাজ্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল কেন? বাকি বেশিরভাগ রাজ্যগুলিতে বিক্রয়কর কি পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি? বিহার, আসাম, ওড়িশায় তা কত?

গণশক্তি লিখেছে, চড়া হারে কেন্দ্রীয় কর প্রত্যাহারের যে দাবি উঠেছে তা থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে পেট্রোপণ্যের উপর ধার্য বিক্রয়কর হ্রাস করার কৌশল নিয়েছে। খুব সত্য কথা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব সিপিএমের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও জনগণের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার এই চালাকি করে কংগ্রেস পার পেয়ে যাচ্ছে কী করে? সিপিএম যথার্থ বাধা দিলে কংগ্রেসের সাধ্যই ছিল না এভাবে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ায়।

বস্তুত সিপিএমের প্রতিবাদ যে কতটা লোকদেখানো, সেকথা আবার প্রমাণ হয়ে গেল, ইউ পি এ কো- অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠকে। জানা গেল, ১৫ জুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের আলোচনায় সিপিএম নেতারা পেট্রোপণ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর কমানোর দাবি নিয়ে কোনও কথাই তোলেননি। খবরটা জানাজানি হওয়ায় সিপিএমের তরফে সিপিআই নেতা এ বি বর্ধন বলেছেন, এ বিষয়ে আলোচনার জন্য জুলাইয়ে একটি দিন নির্দিষ্ট করা আছে, ১৫ জুনের এজেন্ডায় এটা রাখা হয়নি। পেট্রল-ডিজেলের দাম নিয়ে বাইরে এত আন্দোলনের হুঙ্কার দিয়ে আসল বৈঠকে সেই ইস্যুকেই আলোচ্য বিষয় না করাকে কী বলা যায়? এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে, বাইরের হুঙ্কার নিছক ভণ্ডামি!

লাভজনক পদ

সঙ্কটগ্রস্ত বুর্জোয়া ব্যবস্থাই দুর্নীতির উৎস

পাঁচের পাতার পর

করে, জয়ী হয়ে তার পাঁচগুণ কামিয়ে নেয়। লাইসেন্স-পারমিট দেওয়া থেকে শুরু করে নানা কায়দায় ঘুষ, উপঢৌকন, উৎকোচ নেওয়া, এগুলি তো এখন মামুলি ব্যাপার। আমলারাও এর অংশীদার। আর যারা কালো টাকার মালিক তারা টাকার জোরে এমএলএ, এমপি'দের প্রভাবিত করে নিজ নিজ স্বার্থ আদায় করে নেয়। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে এস ইউ সি আই দুর্নীতিগ্রস্ত জনপ্রতিনিধিদের পদ খারিজ করার জন্য 'রাইট টু রিকল'-এর অধিকার নির্বাচকদের দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। কিন্তু এ দাবি প্রত্যাশিতভাবেই উপেক্ষিত হয়েছে। [উপরোক্ত তথ্যগুলি হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকা থেকে (৯.৪.০৬) উদ্ধৃত]

সামন্তী শাসনের অবসান ঘটিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন — এই ঘোষণাই ছিল বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। এই ঘোষণার কতটুকু প্রতিফলন আজ বাস্তবে রয়েছে? ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এন এন ভোরা এক রিপোর্টে বলেছেন, এদেশে মাফিয়া নেটওয়ার্ক কার্যত সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা চালাচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, টাকার জোরে মিডিয়া-মাফিয়া ব্যবহার করে যারা এমএলএ, এমপি হিসাবে নির্বাচিত হচ্ছেন তারা মূলত উচ্চবিত্ত, বড় ব্যবসায়ী, বৃহৎ জমির মালিক। গরিব শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধি কার্যত এই ব্যবস্থায় জিততেই পারে না, যদি না মানি পাওয়ার, মাস্‌ল পাওয়ার এবং মিডিয়া পাওয়ারকে পরাস্ত করার মতো রাজনৈতিকভাবে সচেতন লৌহদৃঢ় সংগঠন শক্তি তার থাকে। ফলে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধির নির্বাচিত হওয়ার যে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া আছে, বর্তমানে তা একটি কাগুজে অধিকার ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবে পুঁজি যাদের হাতে সেই বুর্জোয়ারাই জনমত, নির্বাচন, শাসনব্যবস্থা, সরকার সবকিছুর নেপথ্য নিয়ন্তা হয়ে বসে আছে। এটা জনগণের শাসন নয়। জনগণের স্বার্থে বুর্জোয়া পার্লামেন্টে কোন আইন রচিত হচ্ছে না। জনগণের নামে, দেশের স্বার্থের কথা বলে সেখানে যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে সেগুলি কার্যত বুর্জোয়াদের স্বার্থেই কাজ করছে। এম এল এ, এম পি'রা বিধানসভায় বা পার্লামেন্টে জনস্বার্থকে প্রতিধ্বনিত করছেন না। বাস্তবে এম এল এ, এম পিদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা। এর বিনিময়ে এমএলএ, এমপি'রা বিপুল সুবিধা ভোগ করছে। স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরেও শুধু পশ্চিমবঙ্গেই পানীয় জলের অভাবে আর্সেনিক যুক্ত জল পান করে কয়েক কোটি মানুষ আক্রান্ত। সরকারে যাঁরা আসীন তাদের এ নিয়ে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এমএলএ, এমপি'দের ভাতা, সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এস ইউ সি আই বাদে সব দলই এক। এরাই সহমতের ভিত্তিতে লাভজনক পদ আঁকড়ে থাকার জন্য সংশোধনী বিল নিয়ে এল। এদের দেখেই এখন রাজনীতিকে অনেকে 'ব্যবসা' বলে অভিহিত করছেন। কথাটা ঠিকই। তবে মনে রাখা দরকার, এটা বুর্জোয়া রাজনীতি — যার শরিক সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো বামপন্থী নামধারী দলগুলিও। তাই লোকসভার সিপিএম নেতা বাসুদেব আচারিয়া সম্প্রতি গণশক্তি পত্রিকায় এই প্রশ্নে আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি নিবন্ধ লিখে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, সংবিধানে লাভজনক পদের কোনও সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, অতএব আইন সংশোধনে কোনও অন্যায় হয়নি। এভাবেই তিনি নৈতিকতার গুরুতর প্রশ্নকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, যা তাঁর দলের দেউলিয়াপনাকেই আরও প্রকট করে দিয়েছে।

ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়া কোন আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিশ্বের সর্বত্র বুর্জোয়াব্যবস্থা আজ আদ্যোপান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ, পুঁজিবাদ আজ ক্ষয়িষ্ণু, সঙ্কটগ্রস্ত। মুনাফার জন্য দুর্নীতি তার নিত্যসঙ্গী। তাই দেখা যাচ্ছে, ডান-বাম যে সমস্ত দলগুলি বুর্জোয়াব্যবস্থার সঙ্গে আপস করছে তাদের মধ্যে দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিস্বার্থবোধ উৎকটরূপে দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে এস ইউ সি আই-এর মতো দল যারা এই শোষণমূলক ব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামে নিরন্তর লিপ্ত থেকে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা করছে, সংগ্রামের ধারায় তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে উন্নত চারিত্রিক মান। বুর্জোয়াব্যবস্থা আজ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ধারণ করেছে। এই ব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকবে দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচারের হাত থেকে ততদিন সমাজের মুক্তি নেই। ফলে, রাজনীতিতে দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচার দেখে কেবল হতাশ হলে জনগণের মুক্তি নেই। যে বুর্জোয়াব্যবস্থা আজ একটা গলিত শবদেহের মতো, তার উচ্ছেদ ব্যতিরেকে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ কল্পনাতীত। ফলে যারা এর পরিবর্তন যথার্থই চান, তাদের পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লবী রাজনীতিকে সক্রিয়ভাবে শক্তিশালী করা দরকার। একমাত্র এ পথেই রাজনীতিতে স্বচ্ছতা, নৈতিকতা আনা সম্ভব।

~~দক্ষিণ ২৪ পরগণা~~

রেশন কার্ড, বিপিএল কার্ডের দাবিতে জয়নগর ২নং ব্লক অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

গত ৭ জুন জয়নগর ২নং বিডিও অফিসে ব্লকের অধীন বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় সহস্রাধিক মানুষ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন সংগঠিত করে এবং বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলের হাজার হাজার নারী-পুরুষের রেশন কার্ড নেই। হাজার হাজার গরিব মানুষের নাম বিপিএল তালিকাভুক্ত হয়নি। কার্ড নিয়ে সিপিএমের মদতে কিছু সরকারি অফিসার চূড়ান্ত দলবাজী ও দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। জেলা পরিষদ ২নং ব্লক ফুড ইন্সপেক্টরকে সিপিএম দলের হাতে ২২০০-র বেশি রেশন কার্ড তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়, যা প্রশাসনকে সিপিএম-এর হাতের পুতুলে পরিণত করার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রেশনকার্ড বণ্টন নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান ও সমিতির সদস্যদের নিয়ে এক যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমভাবে রেশন- কার্ড বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তকে সিপিএম নেতৃত্ব নগ্নভাবে অগ্রাহ্য করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ কতিপয় সরকারি অফিসারের গাফিলতিতে চূড়ান্তভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এই সমস্ত দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে বিডিও কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। সমাবেশে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার, পার্টির বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড আলাম খাঁ, আনসার সেখ, গোবিন্দ আহিরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুকুমার হালদার।

এলাকা উন্নয়নের দাবিতে পাথরপ্রতিমায় পথ অবরোধ ও কনভেনশন

পাথরপ্রতিমা থানার দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর অঞ্চলের উত্তরাবাদ-মন্দিরঘাট পাকা রাস্তা নির্মাণ, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সহ এলাকার উন্নয়নের দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গত ২২ মে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। গোরাচাঁদ পুরকাইত, কেশব হালদার, অশোক রায়, আক্তার লস্কর, গৌতম হালদার, বাদল মাঝি প্রমুখের নেতৃত্বে কনভেনশন থেকে দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর আঞ্চলিক নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য, রাস্তা নির্মাণের দাবিতে গত ২ মে অঞ্চলের মা-বোন সহ শত শত মানুষের পথ অবরোধের চাপে ৪ মে বিডিও আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসে অবিলম্বে ঐ দাবি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন।

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ

সরকারকেই উদ্ভূত সঙ্কট নিরসন করতে হবে

একের পাতার পর

পাওয়ার পর ট্রেনিং নিতে যেতেন। এমনকী ট্রেনিং নিলে যেমন কিছুটা বেতনবৃদ্ধি হত, ট্রেনিং না নিলেও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ট্রেনিং নেওয়ার বাধ্যবাধকতা বা চাহিদা অনেক কম ছিল। তাই অল্প কিছু ট্রেনিং সেন্টার ছিল — যার পুরোটাই সরাসরি সরকারি পরিচালনায় চলত। বেসরকারি ট্রেনিং সেন্টার বলে কিছু ছিল না।

কিন্তু এই সরকারের আমলে অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতো প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও চাকরির সুযোগ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ১৯৭৭ সালে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার পরও পূর্বের ধারা অনুসরণ করে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নূতন স্কুল স্থাপন ও শিক্ষক নিয়োগের জন্য কিছু কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছে, কিন্তু ১৯৮৩ সাল থেকে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থা চলতে থাকে প্রায় ২০ বছর। এই সময়ের মধ্যে কিছু শিক্ষক নিয়োগ বা দু'চারটি স্কুল যে তৈরি হয়নি, তা নয়। কিন্তু সেগুলি মূলত ১৯৭৭-৮২ পর্যন্ত যে কোটা মঞ্জুর করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ পূরণ না হওয়ায় বাকি পড়েছিল, তারই কিছু কিছু মাঝে মধ্যে হয়েছে। আর হয়েছে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর ফলে কিছু নিয়োগ।

কিন্তু দীর্ঘ ২০ বছর ধরে মূলত অবসরজনিত কারণে প্রতিটি জেলায় হাজার হাজার শিক্ষকপদ শূন্য হতে থাকে। বিশেষত শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬৫ থেকে কমিয়ে ৬০ বছর করায় এক ধাক্কায় হাজার হাজার শিক্ষকপদ শূন্য হয়। সরকার বলেছিল — এই সমস্ত শূন্যপদে বেকারদের চাকরি দেবে। কিন্তু বাস্তবে নিয়োগ বিশেষ কিছুই হয়নি, ফলে শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে ৪৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকপদ শূন্য। বেশিরভাগ স্কুলে শিক্ষক মাত্র দু'জন বা একজন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ক্রমেই শিক্ষক নিয়োগের জোরালো দাবি উঠতে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভও শুরু হয়। তা দেখে সরকার নতুন চাল চালল। তারা হঠাৎ ঘোষণা করল — শিক্ষকপদে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিনা দেখতে হবে। এই মর্মে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা বিধানসভায় শিক্ষক নিয়োগের আইনও সংশোধন করিয়ে নেয়। উদ্দেশ্য কী? ৪৫ হাজার শূন্যপদ তো আছেই, এছাড়া আরও অতিরিক্ত ১০ হাজার শিক্ষক এবং ২০০০ নূতন স্কুলের জন্য আরও ৮ হাজার শিক্ষক, অর্থাৎ সর্বমোট ৬৩ হাজার শিক্ষক নিয়োগের যে দাবি — তাতে সহজেই জল ঢেলে দেওয়া যাবে। কারণ এত ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তি একবারে পাওয়া যাবে না। 'আন-ট্রেইনড্' নিলে তো যা বেকারের ছড়াছড়ি, কোন পদ খালি থাকবে না। তখন যদি সব শূন্যপদ পূরণ না হয়, তাহলে বিক্ষোভ হতে পারে এবং তীব্র বেকার সমস্যার যুগে তা মারাত্মক আকার নিতে পারে। তাই এমন ব্যবস্থা কর যাতে বিক্ষোভ দূরের কথা, সামান্য প্রতিবাদও উঠবে না। কারণ ট্রেনিং না নিলে চাকরি পাওয়া যাবে না, এই ধারণা থেকে সকলেই ছুটবে ট্রেনিং নিতে। তাই বিক্ষোভের পরিবর্তে দৃষ্টি ঘুরে যাবে ট্রেনিং-এর দিকে এবং হলও তাই।

এভাবে আইন করে ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করার ফলে দেখা গেল, হাজার হাজার বেকার ছেলেমেয়ে ছুটছে ট্রেনিং নিতে। কিন্তু মাত্র ৩৭টা ট্রেনিং কলেজে এত বিপুল সংখ্যক চাহিদা পূরণ হওয়ার নয়। তাই সুযোগ বুঝে সরকার ঘোষণা করে দিল — বেসরকারি ট্রেনিং কলেজ খোলা যাবে। এভাবে রাতারাতি শতাধিক বেসরকারি ট্রেনিং কলেজকে অনুমোদন দেওয়া হল। এই সমস্ত বেসরকারি ট্রেনিং কলেজ খোলার জন্য যারা আবেদন জানাল তারা তার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিয়েছে এবং তার বিনিময়ে তারা ঢালাও ছাড়পত্র পেয়েছে যথেচ্ছ ফি আদায়ের। এমনকী শোনা গেছে, বহু জায়গায় শুধু ভর্তি হতেই ৫০/৬০ হাজার টাকা বা তার বেশি অর্থ গুনাগার দিতে হয়েছে। এছাড়া এই সমস্ত কলেজে যারা ট্রেনিং নেবে তাদের প্রত্যেকের সারা বছরে ফি ইত্যাদি নিয়ে লক্ষাধিক টাকা ন্যূনপক্ষে খরচ। বহু বেকার দরিদ্র ছেলেমেয়ের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য তাদের অভিভাবকরা ঘরের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত বিক্রি করেছেন একটিই আশা নিয়ে যে, ট্রেনিং-এর পরে তারা চাকরি পাবে। কিন্তু কী পরিণতি দাঁড়াল!

সরকার এমন মোক্ষম চাল চালল যাতে সমস্ত শূন্যপদ পূরণে যেমন এত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ে পাওয়া যাবে না, তেমনি অন্যদিকে বেসরকারি ট্রেনিং কলেজ খোলার অনুমতি দিয়ে কোটি কোটি টাকার কারবারও হয়ে গেল। আবার এক ধাক্কায় ট্রেনিং নেওয়ার খরচও খুশিমত বাড়িয়ে দেওয়া হল। এগুলি নিয়ে বিক্ষোভ থাকলেও প্রতিবাদের পথে না গিয়ে অনেকেই ঘটিবাটি বিক্রি করে হলেও ট্রেনিং নিতে ছুটল, কারণ তাদের ধারণা এতে চাকরি হবেই। আগে ট্রেনিং নিতে আউটসাইডারদের খুব পয়সা খরচ হত। আর চাকরি পাওয়ার পর ট্রেনিং নেবার জন্য ডেপুটেশনে গেলে তাঁরা বেতনের সঙ্গে ট্রেনিং ভাতাও পেতেন। এক ধাক্কায় সব ওলটপালট করে দেওয়া হল এবং বিক্ষোভেও জল ঢেলে দেওয়া গেল। এটাই হল সিপিএমের ধূর্ত কৌশল।

কিন্তু এত কাঠখড় পুড়িয়ে যাঁরা ট্রেনিং নিলেন এবং এঁদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই চাকরিও পেলেন — কী পরিণতি হবে তাঁদের? এঁদের মধ্যে তো অনেকেই এই সমস্ত বেআইনি বলে ঘোষিত ট্রেনিং সেন্টার থেকে পাশ করেছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকে চাকরিও পেয়েছেন। কিন্তু হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী সার্টিফিকেট অবৈধ হলে তো চাকরি নিয়েও টানাটানি পড়বে!

এখন প্রশ্ন, আগে জানা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার এই বেআইনি কাজ করল কেন? এর পিছনে আরও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল কি? শোনা যাচ্ছে, এই ভর্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে এক্ষেত্রে। সরকার নিজেই তো ফরম বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে। না হলে একটা ফরমের দাম ২০০ টাকা হয়? দু'লক্ষের বেশি ফরম বিক্রিতে কত টাকা হয়? অথচ ট্রেনিং-এর আসন মাত্র ২০/২২ হাজার।

রাজ্য সরকারের তখনই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল — যখন মাঝপথে (প্রায় ৭/৮ মাস আগে) ৪০টি ট্রেনিং সেন্টারকে হাইকোর্ট বেআইনি ঘোষণা করে সেগুলির পরীক্ষা বন্ধের আদেশ দেয়। তখন থেকে গুরুত্ব দিয়ে চেষ্টা না করার ফলে বর্তমানে সমস্যা এত জটিল আকার ধারণ করেছে। এমন সব ট্রেনিং সেন্টারকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যাদের পর্যাপ্ত জায়গা, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ইত্যাদির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে উপযুক্ত মানের উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের। এছাড়া এন সি টি ই ইতিপূর্বে রাজ্য সরকারকে একাধিকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তাদের অনুমোদন নেওয়ার ব্যবস্থা করেনি কেন? নির্বাচনের আগে পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেছিলেন — কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর সাথে কথা বলে সব ঠিক করে দেবেন! এই মর্মে তখন কিছু সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পরে সব ওলটপালট হয়ে গেল কেন? এগুলি কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সুপরিকল্পিত নয়? এমনকী গত ১৯ জুন বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যেও সমাধানের কোন ইঙ্গিত নেই, বরং কোর্টের অজুহাতের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি — এর দায় সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের। যাঁরা ট্রেনিং নিয়েছেন বা এখনও পাঠরত, তাঁদের এক্ষেত্রে কোন দোষ নেই। তাঁরা রাজ্য সরকারের নিয়মনীতি মেনেই সব কাজ করেছেন। আজ এগুলি বেআইনি হলে তার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগানো চলবে না। সরকারকেই পথ খুঁজে বের করতে হবে এঁদের নিরাপত্তার। এঁদের সার্টিফিকেট বৈধ করতে হবে, ফাইনাল পরীক্ষা অবিলম্বে শুরু করতে হবে, যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে এবং আসন্ন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু করতে হবে।

যদি এই কাজ সরকার না করে বা অন্যরকম কিছু করার চেষ্টা করে তাহলে রাজ্যব্যাপী চরম বিক্ষোভ আন্দোলন হতে বাধ্য, যার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

চাষীর জমি ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে এসডিও দপ্তরে ডেপুটেশন

উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জিগির তুলে সিপিএম তথা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গরিব-মধ্যবিত্ত চাষীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। চাষীর রুটি-রুজি মেরে দোফসলি, তিন ফসলি জমিতে দেশ-বিদেশের মালিকগোষ্ঠী মুনাফার স্বার্থে গড়ে তুলবে বড়লোকদের জন্য আবাসন প্রকল্প, শপিং মল, ফ্লাইওভার, বিলাস কেন্দ্র।

এই সর্বনাশা চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাতে চাষীরা ১৯ জুন হাজির হয়েছিল বারুইপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে, এস ইউ সি আই-এর ডাকে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ডেপুটেশনে।

জয়নগর কুলতলী, ভাঙ্গড়, বারুইপুর, সোনারপুর থেকে কয়েক শত কৃষক ও সাধারণ মানুষ বারুইপুর স্টেশন থেকে মিছিল করে মহকুমা শাসক দপ্তরে উপস্থিত হয়। সেখানে বিক্ষোভ সভা থেকে এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ৭ জনের প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও ৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেন। তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

সভায় বিভিন্ন বক্তারা এই সরকারি চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও জমি রক্ষার্থে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গ্রামে-গ্রামে 'জমি বাঁচাও কমিটি' গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

---

৭ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি

একের পাতার পর

পড়ে থাকা। সিপিএম সমর্থিত কো-অর্ডিনেশন কমিটিও এখন আর কেন্দ্রের হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে সোচ্চার নয়। এ যদি কর্মচারীদরদ হয় তবে সিপিএম কর্মচারীদরদী বটে !

সাত লাখের চাকরির টোপ ঝুলিয়েছেন অসীমবাবু। কোত্থেকে হবে চাকরি ? উনি বলেছেন, কৃষিতে কর্মসংস্থান হবে দু'লাখ। এদিকে চাষীর জমি কেড়ে শিল্প হচ্ছে, বছরে লক্ষাধিক হারে খেতমজুর বাড়ছে। গ্রাম ছেড়ে শ'য়ে শ'য়ে খেতমজুর ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে কাজের সন্ধানে। বাকি পাঁচ লাখের কর্মসংস্থান হবে স্বনিযুক্তিতে, অর্থাৎ 'চরে খাও' নীতি। মাঠে ঘাস থাকলে তো চরে খাবে, নইলে চরাই সার, খাওয়া জুটবে না। একটা করে শিল্প বন্ধ হচ্ছে, আর শিল্পাঞ্চল শ্মশান হচ্ছে। বাজার-হাট, দোকান-পসার উঠে যাচ্ছে। স্বনিযুক্তি হবে কোথা থেকে ? ঢালাও মদের লাইসেন্স আর অনলাইন লটারি ছাড়া কর্মসংস্থান কোথায় ? অসীমবাবু অবশ্য বলেছেন, পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বাড়াবেন ১৭ শতাংশ। ৫৫৫৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৫০২ কোটি টাকা দেবেন পরিকল্পনা খাতে। অর্থাৎ প্রায় ১০০০ কোটি টাকা বাড়াবেন। এতেই পাঁচ লাখের স্বনিযুক্তি হবে ? মাথা পিছু প্রায় ২০০০ টাকা দিলেই একজন বেকারের স্বনিযুক্তি হয়ে যাবে ?

অসীমবাবু বলেছেন, কর আদায় বাড়িয়ে ঘাটতি কমাবেন। সাধু প্রস্তাব। এবার তিনি এক চিনি বাদে প্রধানত বিলাসদ্রব্যের উপরই কর বাড়িয়েছেন। তাজ্জব হল এ'নিয়ে বেশি কৃতিত্ব তিনি দাবি করেননি, গলা বাড়িয়ে বলেননি, 'করহীন বাজেট' করেছি। কেন এই নীরবতা ? কারণ তিনি জানেন, এ নিয়ে নাড়া দিলেই লোকে বলবে, বাজেটে আগেই পেট্রল-ডিজেলের বাড়তি দামের ওপর বাড়তি কর বসানো হয়ে গিয়েছে। এ থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার জনগণের পকেট কেটে তুলে নিয়েছে। বিদ্যুতের দাম বেড়েছে চড়া হারে, তাল রেখে বেড়েছে ট্যাক্স। অর্থাৎ বাজেটের বাইরেই যে ট্যাক্স বাড়ানো হয়ে গিয়েছে — এই কথাটা পাছে খুঁচিয়ে তোলা হয়, তাই অসীমবাবু কর না বসানোর সাফল্যের দাবি করেননি।

বাজেটে তিনি বেসরকারীকরণের ঢালাও সুপারিশ করেছেন, পড়লে মনে হবে যেন কোন কংগ্রেস বা বিজেপি অর্থমন্ত্রীর বেসরকারীকরণের ফতোয়া। শুধু বলেছেন, যেসব ক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকরা বিনিয়োগে আগ্রহী নন, সেসব ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করবে। অর্থাৎ যেখানে মুনাফা, যেখানে বিনিয়োগে মালিকরা আগ্রহী, সেসব ক্ষেত্র বেসরকারি হাতে তারা ছেড়ে দেবেন। তাহলে সিপিএম কী করবে ? রাস্তায় নেমে বেসরকারীকরণ বিরোধী আন্দোলনের নাটক করবে, আর তাদের সরকারই বেসরকারীকরণ করবে ঢালাও। এমন বাজেট যে পুঁজিপতিদের আশীর্বাদ পাবে তাতে আর আশ্চর্য কী ?

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

সিপিএম সরকারের ত্রিশ বছর

দীর্ঘ আয়ু মানেই সার্থক অস্তিত্ব নয়

মুখ্যমন্ত্রী, সিপিএম দল ও আনন্দবাজার পত্রিকা যেটি অধুনা সিপিএম দলের প্রায় মুখপত্রের ভূমিকা পালন করছে — এরা সম্মিলিতভাবে, সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের ত্রিশ বছর শাসনপূর্তিকে 'অভূতপূর্ব সাফল্য', 'ঐতিহাসিক রেকর্ড' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে জনসাধারণকে দিয়ে তা গলাধঃকরণ করানোর কম চেষ্টা করছে না। আনন্দবাজার পত্রিকা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে প্রচার করছে, ত্রিশ বছরে কী বিরাট অগ্রগতি পশ্চিমবঙ্গকে এনে দিয়েছে এই সরকার। বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মুখেও সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ভূয়সী প্রশংসা, মুখ্যমন্ত্রীর নামে জয়ধ্বনি। মুখ্যমন্ত্রী সুযোগ পেলেই বলছেন,'আমরা এটা করেছি, ওটা করেছি, যা ভারতে অন্য কোনও সরকার করতে পারেনি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিপিএম সরকারের শাসনে এরাজ্যে সাধারণ মানুষের জীবনে সমস্যা সমস্ত দিক থেকে কি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন, আমরা তাদের সার্থকতার মাত্র দু'টি বিষয় এখানে উল্লেখ করব। সরকারের ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সরকার ও তার তাঁবেদারদের পারস্পরিক পিঠ চাপড়ানির মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে গেলেন দেশের শীর্ষ একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর মালিক মুকেশ আম্বানি। তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আলিঙ্গনের ছবি পরদিন সকল সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হল। দিকে দিকে ধন্য ধন্য আওয়াজ, যেন এইবার পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য খুলে যাবে ! আম্বানি গোষ্ঠীর হাত ধরে ভাগ্য খোলার প্রথম যে দৃষ্টান্তটি জানানো হল, তা হচ্ছে, হরিণঘাটার সরকারি দুগ্ধ প্রকল্পটিকে সিপিএম সরকার মুকেশ আম্বানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেবে, কারণ রাজ্য সরকার সেটি আর চালাতে পারছে না।

হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় পাঁচ দশক আগে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকারের আমলে। নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরিব পরিবারের শিশু ও বৃদ্ধদের এবং হাসপাতালের রোগীদের জন্য স্বল্পদামে দুগ্ধ সরবরাহ করার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রকল্পের প্রতিষ্ঠা। সেদিন সরকার এই দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেনি। প্রকল্পটির যথেষ্ট সুনামও ছিল। ১৯৭৭ সালে রাজ্যের সরকারে বসে সিপিএম এই চালু প্রকল্পটি পরিচালনার দায়িত্ব পায়। একটানা ত্রিশ বছর চালাবার পর অধুনা তারা বলছে, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প সরকার আর চালাতে পারছে না। কিন্তু কেন ? হরিণঘাটার সরকারি দুধের দাম তো নানা বেসরকারি সংস্থার সরবরাহ করা দুধের থেকে খুব কম কিছু নয় ! সিপিএম সরকার বহুবার দুধের দাম বাড়িয়েছে। দুধের চাহিদাও আদৌ কম নয়। বহু ছোট-বড় বেসরকারি সংস্থা ইতিমধ্যে কলকাতা শহরে চুটিয়ে দুধের ব্যবসা করছে। তাহলে যে সরকার গরিব-মধ্যবিত্ত জনগণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত একটা চালু দুধ সরবরাহ ব্যবস্থা হাতে পেয়েও, ত্রিশ বছর ক্ষমতায় থেকেও তা সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারে না এবং একচেটিয়া পুঁজির হাতে মুনাফা করার জন্য তুলে দেয়, তাকে জনস্বার্থবাহী বলা তো দূরের কথা, ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন একটা সরকার বলা যায় কি ?

কলকাতা ও অন্যান্য জেলাশহরের রাষ্ট্রীয় পরিবহন সম্পর্কেও কি একই কথা খাটে না ? কলকাতার রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা একসময় সারা দেশের সামনে দৃষ্টান্ত ছিল। উত্তরে শ্যামবাজার থেকে দক্ষিণে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পরিবহন বলতে একমাত্র সরকারি বাসই ছিল, বেসরকারি বাসের চলবার অনুমতিই ছিল না। সিপিএমের একটানা ত্রিশ বছরের 'রেকর্ড' শাসনে আজ সরকারি বাসের দেখাই পাওয়া যায় না, সর্বত্র বেসরকারি পরিবহন ব্যবসার অসভ্য দাপট। গত ত্রিশ বছরে দফায় দফায় সিপিএম সরকার বাস-ট্রামের ভাড়া বাড়িয়েছে, নানা ফন্দি-ফিকিরে 'বিশেষ বাস' চালু করে বিপুল ভাড়ার হারও করা হয়েছে, তবুও এরাজ্যে সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা ধুঁকছে, যার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে দায়িত্বহীন বেসরকারি বাসমালিকরা। ঠিকভাবে বললে, সরকারই সে সুযোগ তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। অথচ ভারতবর্ষে অন্যান্য বড় শহরগুলিতে দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বই ও অন্যত্র পরিবহন ব্যবসা পুরোপুরি সরকারের অধীনেই আজও চালু আছে। দক্ষিণপন্থী দলের সরকারগুলো যা পারে, একটা 'বামপন্থী' নামের সরকার একটানা ত্রিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও যদি সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, তবে সেই সরকারকে কোন্ বিশেষণে ভূষিত করা উচিত ? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, অপরাধ, নারীনির্যাতন, নারীপাচার ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি চোখ দিলে সিপিএম শাসনের যে রেকর্ড ধরা পড়ে, তা কি নিদারুণ লজ্জার নয় ?

অতএব, মুখ্যমন্ত্রী, সিপিএম নেতারা ও সংবাদমাধ্যম সিপিএমের ত্রিশ বছর সরকারে থাকার 'রেকর্ড' প্রচারের সময় এ সত্যটা খেয়ালে রাখলে ভাল করবেন — দীর্ঘ আয়ু মানেই সার্থক অস্তিত্ব নয়।

বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধতায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অল ইন্ডিয়া কমিটির সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী ২৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেছেন,

''অত্যন্ত লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি এবং নেভেলি লিগনাইট কর্পোরেশনের ১০ শতাংশ শেয়ার বিলগ্নীকরণের যে নিন্দনীয় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার নিয়েছে, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করি। আসলে বেসরকারীকরণের মূল লক্ষ্য হাসিল করার জন্যই গৃহীত এই বিলগ্নীকরণের পক্ষে অজুহাত হিসাবে তহবিল সংগ্রহের যেকথা বলা হচ্ছে, সেটাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। টাকা তোলাই উদ্দেশ্য হলে, বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার অনাদায়ী আয়কর সরকার অনায়াসেই সংগ্রহ করতে পারে।''

কমরেড চক্রবর্তী বিবৃতিতে আরও বলেছেন, ''আমাদের সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী মনে করে, 'নবরত্ন' ও লাভজনক সংস্থাগুলি দূরের কথা, যেসব বুনিয়াদী শিল্পগুলি অর্থনীতির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়, সেগুলি যদি এমনকী অলাভজনকও হয়, তবুও তাদের বেসরকারীকরণ করা উচিত নয়।

''বিশ্বায়নের লক্ষ্য পূরণ করার জন্যই জোর কদমে বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। সূচনায় কংগ্রেস সরকার, তারপর যুক্তফ্রন্ট সরকার, এন ডি এ সরকার এবং এখন সিপিএম সমর্থিত ইউ পি এ সরকার সেই একই লক্ষ্যে একই নীতি নিয়ে চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘৃণ্য পদক্ষেপকে রুখবার জন্য দেশের শ্রমজীবী জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।''

ইউক্রেনে গঠিত হল অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ফোরাম

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে এক অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল পূর্বতন ইউক্রেন। কী শিল্পে বা প্রযুক্তিতে কী কৃষিতে তার উন্নতি ছিল সে যুগে সত্যিই অভূতপূর্ব। কৃষিতে অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার সাফল্য ছিল এতটাই যে, ভূগোলে তাকে প্রায়শই 'সোভিয়েতের শস্যাগার' হিসাবে বর্ণনা করা হত। নিপার, নিস্তার ও দন এই তিন নদীবিধৌত উর্বর সমভূমি এবং সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো খুব সহজেই তাকে সেদিন এই গৌরবজনক শিরোপায় ভূষিত করেছিল। তার ওপর ছিল রাজধানী কিয়েভ ও খারকভকে কেন্দ্র করে ও কৃষ্ণসাগরের তীর বরাবর ওদেসা, খার্সন, সেবাস্তোপোল প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠা নানারকম শিল্প ও কলকারখানা। এই সবেরই মিলিত ফল ছিল সেদিনের ইউক্রেনের এই সমৃদ্ধি।

অবশ্য এই সমৃদ্ধির পিছনে সেখানকার মানুষের ভূমিকাও কিছু কম ছিল না। সোভিয়েত বিপ্লবের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই এই অঞ্চলের মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের হাতে হাত মিলিয়ে ধীরে ধীরে রচনা করেছিল তার এই সমৃদ্ধ ইতিহাস। তার জন্য অবশ্য সেদিন মূল্যও কিছু কম দিতে হয়নি। বিপ্লবের একেবারে প্রথম দিকের দিনগুলিতেই এই অঞ্চল ভয়াবহভাবে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে জেনারেল দেনিকিন, কর্নিলভ প্রভৃতির নেতৃত্বে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট প্রতিবিপ্লবী শ্বেতরক্ষী বাহিনীগুলির আক্রমণে। কিন্তু সে আক্রমণকে সফলভাবে প্রতিরোধ করে এই অঞ্চলের মানুষ সেদিন লেনিন ও তারপর স্ট্যালিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক পথে দেশগঠনের দিকে পা বাড়ায়। এরপরও এই অঞ্চলের উপর দিয়েই বয়ে যায় এ পর্যন্ত ইতিহাসের ভয়াবহতম সামরিক আগ্রাসন — জার্মান নাৎসি আক্রমণ। এতসব ঝড়ঝাপটা সহ্য করেও কিন্তু সেদিন ইউক্রেন আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, সমাজতন্ত্রের হাত ধরে এগিয়ে চলেছিল সমৃদ্ধির পথে।

কিন্তু ১৯৯১ সালে সোভিয়েতের পতনের পর ইতিহাসের গতি বয়ে চলল একেবারেই উল্টোপথে। সেদেশে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল বুর্জোয়াশ্রেণী। ক্ষমতায় বসেই তাদের প্রথম কাজ হল নিজেদের মস্কো থেকে বিচ্ছিন্ন করা, যাকে তারা নাম দিল ''দেশের স্বাধীনতা অর্জন'' ও ''রুশ আধিপত্যবাদের হাত থেকে মুক্তি অর্জন করা।''

এরপরই শুরু হল আরেক ভোজবাজি। দেশজুড়ে বেকারি, কর্মহীনতা ও অসামঞ্জস্য যাতে আবার মানুষের মুখ সমাজতন্ত্রের দিকে ফিরিয়ে না দেয়, সেই লক্ষ্যে শুরু করা হল এক ভয়াবহ খেলা। দিকে দিকে নানা নব্য ফ্যাসিবাদী গ্রুপকে মদত দেওয়া হতে থাকল ও সেই মতো প্রচার তুঙ্গে তোলা হতে থাকল। প্রায় গোয়েবল্‌সীয় ঢংয়েই শুরু হল প্রচার — সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কত খারাপ ছিল, মানুষকে সেখানে কী অপরিসীম দুর্দশার মধ্যে দিনযাপন করতে হত। সেই সঙ্গে শুরু হল অন্ধ ইউক্রেনীয় জাতীয়তবাদের প্রচার ও প্রবল রুশবিরোধী বিদ্বেষ। শত শত বছর ধরে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-ভাষাভাষী মানুষ সেখানে পাশাপাশি বাস করে এসেছে, আজ হঠাৎ তাদের বিরুদ্ধে শুরু করা হল হুঙ্কার। উগ্র ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদের নামে শুরু হল তাদের উপর জাতিদ্বেষী ভাষাদ্বেষী প্রবল আক্রমণ। সেই সাথে যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে অবাধে ছড়িয়ে দেওয়া হতে থাকল অশ্লীলতা, যৌন ব্যবসা, নেশা ও মাদকতার নানান সামগ্রী। আর এসবেরই পিছনে মদত জুগিয়ে যেতে থাকল পুঁজিপতিদের মদতপুষ্ট সরকার।

সত্যি বলতে আজ সেদেশের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। ১৯৯১ সালের প্রতিবিপ্লবের পর থেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই তথাকথিত 'শান্তি'র মধ্যেই দেশের কোথাও কোনওরকম যুদ্ধ না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র হানাহানিতে আজ পর্যন্ত সেখানে মারা গেছেন ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ। সেইসঙ্গে দেশে আইনকানুনের প্রায় কোনও বালাই নেই। অবাধে চলছে খুন, রাহাজানি ও নানপ্রকার যৌন অপরাধ। সবমিলিয়ে দেশে আজ এক অরাজক পরিস্থিতি।

এই ধরনের নব্য-ফ্যাসিবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ যে একটি দেশকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল যুগোস্লাভিয়া। মাত্র দেড় দশক আগের সুসংহত শক্তিশালী দেশটি জাতিদাঙ্গায় ভেঙে পৃথক পৃথক দেশে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যারা প্রত্যেকেই জাতিদাঙ্গায় দীর্ণ। আজও তা ক্রমাগত আরও ভাগ হয়ে চলেছে। ইউক্রেনের পরিণতিও যাতে সেদিকেই না গড়ায়, সেই উদ্দেশ্যে আজ সেদেশের মানুষই এগিয়ে এসেছেন। গত ৩ মার্চ, ২০০৬ রাজধানী কিয়েভের লেনিনের নামাঙ্কিত পূর্বতন মিউজিয়াম ভবনে তাঁরা মিলিত হয়ে গঠন করেছেন একটি ফ্যাসিবিরোধী ফোরাম। এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন দেশের প্রায় ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং কমসোমল, ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত অফিসারস, ইনটেলিজেনশিয়া ফর সোস্যালিজম, ইউনিয়ন অফ উইমেন ওয়ার্কারস, ইনটারন্যাশনাল পিস ফোরাম প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিরা। সম্মেলনে সরকার বর্তমানে হিটলারকে সাহায্যকারী ওইউএন-ইউপিএ-র মতো সন্ত্রাসবাদী সংস্থার যেসব কুখ্যাত ব্যক্তিকে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের কাণ্ডারীর সম্মান দিতে চলেছে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয় ও দাবি জানানো হয়, ইউক্রেনকে অবিলম্বে ন্যাটোর সদস্যপদ ত্যাগ করতে হবে। জনগণের উদ্দেশে সম্মেলন থেকে নব্য-নাৎসিদের ও তাদের মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। ইউক্রেনীয় পিপল্‌স ডেপুটি জেনারেল বুইকোকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে সেইসাথে একটি ফ্যাসিবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়।

(সূত্র ঃ নর্থস্টার কম্পাস, এপ্রিল, ০৬)

অ্যাবেকার দাবি মানতে বাধ্য হল কমিশন

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ২৪নং রেগুলেশনের ৭নং ধারায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধি থাকা সত্ত্বেও তা দেওয়া হত না। 'অ্যাবেকা'র আন্দোলনের ফলে নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আদেশবলে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি বাধ্য হয়ে তা দিতে শুরু করেছে। 'অ্যাবেকা' দাবি করেছে — উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য লোডশেডিং হলেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা কোম্পানির রিজনেবল রিটার্ন থেকে বাদ দিতে হবে। এই অর্জিত অধিকার আদায়ে গ্রাহকদেরও এগিয়ে আসার জন্য 'অ্যাবেকা' আহ্বান জানিয়েছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in